স্বাহা

মহাশ্বেতা দেবী

বাণীশিল্প কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৭১

প্রকাশক
অবনীন্দ্র বেরা
বাণীশিল্প
১১৩ই, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রাকর
নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০০০৬

লিপি ঘটক
মৈত্রেয় ঘটক

সন্ধ্যে হবার আগেই মিণ্টো পার্কের বাড়িতে আলো জ্বলেছিল। শীতের সন্ধ্যে খুব তাড়াতাড়ি আসে। সমস্ত বাড়িতে আলো জ্বলল। নিচে কাচের বাসনের টুং টাং শব্দ। নীল দরজায় টোকা মেরে গেল, 'মা গেট্‌ রেডি। আমি সোনালিকে আনতে যাচ্ছি।'

—'ইয়েস।'

স্বাহা ভেতর থেকে বললেন। বিশাল দেয়াল-ঢাকা আয়নার সামনে হাঁটছিলেন উনি। হেঁটে দেখছিলেন শাড়ির কুঁচি ঠিক ভাবে পড়ল কিনা। হাঁটতে হাঁটতে ওঁর বয়স কমে যাচ্ছিল। একদিন ভাইসরয়ের সিমলার বিউটি কুইন হয়ে যাচ্ছিলেন উনি। সব দেখতে পাচ্ছিলেন মনের চোখে। হঠাৎ গোলাপের গন্ধে ঘর ভরে গেল। ঘরটার দেয়াল মিলিয়ে গেল কোথায়। জানলার ওপারে কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যায় বরফ ঢাকা পাহাড়। বরফ পড়ছে, বরফ পড়ছে, সব তুষারে ঢেকে যাচ্ছে, শ্বেতশুভ্র সব। নিস্তব্ধ।

স্বাহা চোখ তুললেন। ওই তো নেমে আসছেন তিনি মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে। বয়স কমে পঁচিশ। সাদা বেনারসী পরেছেন, সাদা সাটিনের হাতকাটা জামা, ক্রাউন খোঁপায় সাতলহরী মুক্তো জড়ানো, গলায় মুক্তোর রোপ, হাতে ঝুরো মুক্তোর চওড়া পেটি, কানে মুক্তোর ঝুম্‌কো·········

সবাই হাততালি দিচ্ছে। ব্যাণ্ড বেজে উঠল। বড়লাট পানপাত্র তুলে ধরেছেন। সিমলাতে ভাইসরয়ের বল্ ডান্‌সে মিসেস স্বাহা রায় বিউটি কুইন হয়েছেন। কি আনন্দ!

সব দেখতে পাচ্ছেন স্বাহা রায়। একা থাকলে উনি সময়ের ওপর পা ফেলে অতীতে চলে যান, বর্তমানে ফিরে আসেন। এখন উনি সিমলায়। এখন উনি বিউটি কুইন। সব দেখতে পাচ্ছেন উনি—সবাই হাততালি দিচ্ছে, কিন্তু অনল রায়, ওঁর স্বামী, ওঁর দিকে চেয়ে আছেন হিংস্র রাগে।

অনল, তুমি অমন করে চেয়ো না। এই ফুলের মুকুট, বাজনা, আলো, হাততালি আমি ভালবাসি, আমার দরকার হয়। কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমি অনল, আমি স্বাহা। তুমি যে বল ভাগ্য আমাদের পরস্পরের জন্য গড়েছিল? আমি বিউটি কুইন হয়েছি, পুরুষরা আমাকে মুগ্ধ হয়ে দেখছে। আজ রাতে প্রিন্স আমাকে নিয়ে নাচতে যাবে। কাল নিয়ে যাবে রাইড করতে। কিন্তু আমি তো তোমাকেই ভালবাসি। তোমার চোখ অত হিংস্র কেন?

তোমার চোখে আগুন জ্বলছে। মাঝে মাঝে, যখন আমাকে কাছে টেনে নাও, তোমার শরীর জ্বলতে থাকে। তাই তুমি অনল। আর তোমাকেই ভালবাসি, তাই আমি স্বাহা।

জানি আজ রাতে তুমি আমাকে নির্মম কথায় বিঁধবে। বলবে—না স্বাহা, কোথাও যাবে না তুমি। বলবে, তোমাকে ঘিরে ওরা স্তাবকতা করবে, তা আমি সহ্য করব না কিছুতে। আজ রাতে তুমি আমাকে—

তারপর ঝড় শান্ত হবে, আগুন নিভবে। না, তোমার আগুন নেভে না। ধিকিধিকি জ্বলে আর জ্বলে। দুজনে দুজনের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে মিশে থেকে কালপুরুষটাকে আকাশের এপার থেকে ওপারে পাঠিয়ে দেব। তারপর, যখন সিমলার আকাশে বরফ ঢাকা চুড়োগুলো নবারুণে লাল হবে, তখন তুমি বলবে, জানো, সুন্দর, তোমার মত সুন্দর একটি মেয়ে হবে আমাদের। নাম দেব নীলাঞ্জনা।

আমি বলব, নীল বলে ডাকব।

কিন্তু আমার তোমার এত চাওয়াতেও মেয়ে হবে না। হবে ছেলে। সে তোমার পৌরুষ, আমার রূপ পাবে না। তাকে 'নীল' বলে তবু ডাকব। কিন্তু তোমার-আমার বুক ভেঙে যাবে, নীল যত বড় হবে।

বুক ভেঙে যাবারই কথা অনল! তুমি আর আমি দিল্লী সিমলার ডাকসাইটে সুন্দর দম্পতি। আমাদের ছেলেমেয়ে হয়নি অনেক দিন! কতজন বলেছে, কেন তোমাদের সন্তান হচ্ছে না?

আমরা বলেছি, আমাদের চেয়েও সুন্দর সন্তান চাই আমরা। অত সুন্দর সন্তান কি চট করে হয়?

সবাই বলেছে, এ তোমাদের বাড়াবাড়ি। সন্তান যেমনই হোক, মা-বাপ তাকে ভালবাসবেই।

আমরা বলেছি, না না, ময়লা কালো বিশ্রী ছেলে বা মেয়ে কে চায়?

আমার মা অব্দি বলেছেন, ও সব কথা বলিস না তুই। ও সব কথা মুখে আনলেও পাপ হয়। শুধু রূপে কি সব হয় মা?

সেই আমাদের ছেলে হল, কি কালো, কি সাধারণ দেখতে! সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে ঢি ঢি পড়ে গেল। সবাই হেসে কুটোপাটি হল। স্বাহার যেমন রূপের গর্ব ছিল, তেমনি একটা কালো কুচ্ছিত ছেলে হয়েছে। —বেশ হয়েছে! অন্যের ছেলেমেয়েকে কখনো কোলে তুলে আদর করেনি। খুব ভালো হয়েছে। রূপের গর্বে মাটিতে পা ফেলত না।

আমার আর তোমার মনের কি অবস্থা হয়েছিল অনল? তুমি বলেছিলে, ওই কেলে কুচ্ছিত ছেলেকে দুধ দেবে না। দুধধাই রাখো একজন।

বলেছিলে, আমার সামনে ওকে আনবে না কখনো।

অনল, এ কি তুমি ভাল করেছিলে? তোমার কথা শুনে নিজের সন্তানকে অবহেলা করে আমি কি ভাল করেছিলাম?

অনল আমি পাগল নই, আমি ভাল করেই জানি আজ বহুদিন হল তুমি মরে গেছ। তুমি ভাগ্যবান। যখন হা-হা করে আগুন জ্বলছিল, শ্বাস আটকে তুমি মরে গেলে। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মরলে। নইলে আমি পুড়ে যেতাম।

আমি জানি, তুমি মরে গেছ সেই কবে। পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল সেদিন। আমি জানি, আমার-তোমার ছেলে নীল একটি মেয়েকে নিয়ে আসছে বাড়িতে। সোনালি। সোনালিকে নীল বিয়ে করবে। সব জানি আমি। তবু আমি জাদুকরী, তুমি বলতে আমি জাদু জানি। মায়াবিনী আমি। যখন মনে করি অতীতে ফিরে যেতে চাই, অনলের সঙ্গে কথা বলতে চাই, তখনি অতীত সত্য হয়ে ওঠে। বর্তমান চলে যায় কোথায়, কোথায় অলীক হয়ে যায়!

কেন মেয়ে চেয়েছিলাম বলত? ঠিক আমার মত রূপের দাহে চঞ্চল একটি মেয়ে?

তুমি বলতে, একদিন তুমি বুড়ো হয়ে যাবে। সেদিন হাজার যত্নেও যৌবনকে ফেরাতে পারবে না। তোমার চুলগুলো সোনালি-লালচে থাকবে না। ঠোঁট থেকে ঝরে পড়বে আনারকলি। ওই গোল্‌ডেন কুইন আপেলের মত বুকও আর থাকবে না।

আমি বলতাম, তোমাব ওই আগুনের মত চেহারাই কি থাকবে বলে ভেবেছ?

তুমি বলতে, তাহলে ঠিক তোমাব মত দেখতে একটি মেয়ে হোক। সে ঘুরবে ফিরবে যখন, তখন তোমাকে নতুন করে দেখতে পাব।

আমি বলতাম, মেয়েকে বিয়ে দেবে না?

তুমি বলতে, আমার মত রূপবান জামাই আনব।

আমি বলতাম, দাঁড়াও—তার আগে প্যাবিসটা ঘুরে আসব। বিউটি ট্রিটমেণ্ট করে চলে আসব। মেয়েব চেয়ে আরো সুন্দর হয়ে যাব।

তুমি বলতে, আর সুন্দর হবার দরকার কি? আমাকে তো পেয়ে গেছ। অন্যেরা তোমায় সুন্দব বলে তা আমি মোটেও চাই না।

তুমি কি জেলাস হতে জানল? তুমি জেলাস হলে আমাব কি ভালই লাগত? যেন শিরায়-শিরায় আগুন বয়ে যেত।

কিন্তু মেয়ে আমাদের হয়নি। মনে আছে আমি তোমার বুকে মুখ রেখে কেঁদেছিলাম। মাতৃত্ব! মাতৃত্ব খুব সুন্দর বলে তুমি ভাবতে না, আমিও নয়। আমার মা বলতেন, রাক্ষুসী! রূপ নষ্ট হবে বলে মা হলি না।

আমি ভাবতাম এই শরীরের রেখা ভেঙ্গে চুরে কুশ্রী হয়ে যাবে, ভাবলে ভয় কবত। তোমার ভাবনাও ঠিক এক রকমই ছিল। তুমিও চাইতে আমি অটুট থাকি যৌবনে। কিন্তু নীল হলে খুব খুশি হয়েছিলাম আমরা দুজনেই। যতক্ষণ ওকে দেখিনি, ততক্ষণ।

নিজেদের কি সর্বশক্তিমান ভেবেছিলাম আমরা তখন? আসলে ভাগ্য আমাদের নিয়ে মজা দেখছিল। দুজনে দুজনকে চেয়েছি। দুজনকে

২

পেয়েছি। কলকাতায় সকলকে নিয়ে সংসার করতে চাইনি। তুমি দিল্লীতে বড় কাজ পেয়েছ। ঐশ্বর্য পেয়েছ, ঐশ্বর্য অর্জন করতে হয়নি। ঐশ্বর্যের মধ্যেই থেকেছ তুমি। দিদিমার বৈভব পেয়েছ। আমার রূপের জোরে আমি এসেছি।

ভাগ্য আমাদের নিয়ে মজা দেখছিল অনল। আমরা ভেবেছিলাম, যা চেয়েছি তাই ই পেয়েছি যখন, তখন মেয়ে চেয়েছি, মেয়েই হবে। কিন্তু হল ছেলে। ছেলেও তোমার মত হতে পারত অনল, কি বা আমার মত। তা হয়নি। ভাগ্য ঠাস করে আমাদের এইভাবে চড় মারে। মনে আছে আমি কি বলে চেঁচিয়েছিলাম? এ আমার ছেলে নয়, তোমরা বদলে দিয়েছ। নার্স, এ কার ছেলেকে এনেছ?

নার্স খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, আপনার ছেলেকে এনেছি। দেখুন কি চমৎকার ছেলে।

আমি কেঁদে বলেছিলাম, না না, এই কালো বিচ্ছিরি ছেলে, এ কখনো আমার ছেলে নয়। তোমরা আমার ছেলেকে অন্য কাউকে দিয়ে দিয়েছ।

তুমি বলেছিলে, নিয়ে যাও ওকে এক্ষুনি।

নার্স খুব অবাক হয়ে নীলকে নিয়ে চলে যায়। যারা বাচ্চা দেখতে আসে তাদের বলে, এ কি রকম মা? এ কি রকম বাপ? ছেলে ওঁদের মত সুন্দর হয়নি বলে ছেলেকে দেখলেনই না?

তখনি মিঃ আর মিসেস কাপুর, মিঃ আর মিসেস দাশ, মল্লিকা সোম, পরভীন মালহোত্রা, সকলে কি মজা পেয়েছিল! সবাই হেসে কুটিপাটি। খুব মজা হয়েছে এবার। খুব জব্দ হয়েছে স্বাহা আর অনল।

মজা তো পাবেই। মেয়েরা আমাকে হিংসে করত। সব সময়ে জানতে চাইত আমি কি মাখি, কি সাবানে স্নান করি। চুল কোথা থেকে রং করাই।

পুরুষরা হিংসে করত তোমাকে। তুমি বড়লোক, বড় চাকরি কর। যে মাইনে পাও, তার চেয়ে বেশি টাকা খরচ কর চাকর-বাকর-বয়-

খানসামা-বাবুর্চি মালীর পেছনে। তুমি শিকার করতে পার, ভালো বিলিআর্ড খেল, ভালো ঘোড়া চড়তে পার।

সকলেই মজা পেয়েছিল।

তারপর যা যা করেছিলাম সে সব কথা ভাবলে আমার খুব কষ্ট হয় এখন। মনে পড়লেই কষ্ট হয়।

তোমার জন্যে নীলকে আমিও খুব অবহেলা করতাম। আমি আর তুমি ঠিক আগেকার মতই দুজনে দুজনকে নিয়ে মেতে থাকতাম। পার্টিতে যেতাম, বাইরে খেতাম, নাচতে যেতাম।

সবাই খুব অবাক হয়ে যেত। গভর্নর জেনারেলের সেক্রেটারির স্ত্রী মিসেস ফুলার আমাকে বলেছিলেন, মিসেস রায়? তোমার বেবি আছে না তিন মাসের?

চার মাসের।

তুমি এত রাত অব্দি এখানে·····

মিসেস কাপুর বলেছিল, স্যাড্‌লি ভীষণ লাকি। ওর বেবি ধাইয়ের দুধ খায়, আয়ার কাছে থাকে।

সে কি? বাচ্চাকে দুধ দাও না?

না! আমার স্বামী পছন্দ করেন না।

মিসেস ফুলার খুব অবাক হয়ে যান। অন্যরাও অবাক হয়ে যেত। আমাকে ওরা মনে করত অস্বাভাবিক জননী।

ওদের বা কি বলব বল? ছেলেকে কোলে নিতাম না, আদর করতাম না, খাওয়াতাম না। নীলকে বড্ড অবহেলা করেছিলাম অনল! মাতৃত্বকে যে বন্ধন মনে হত আমার।

ভেবেছিলাম, নীলকে বাদ দিয়েই আমার জীবন চলবে। কিন্তু এমন কপাল আমার, সেই আমি আর নীল দুজনে সংসারে পড়ে থাকলাম। কিন্তু কোনদিন ও আর আমি কাছাকাছি আসতে পারলাম না।

তুমি কেন মরে গেলে অনল?

তুমি মরে যাবার পর আমি বহুকাল দিল্লী-সিমলা যাই নি। তবে জানি, সবাই খুব খুশি হয়েছিল। প্রতিভা দাশ নাকি বলেছিল, স্বাহা এমন অনন্যাচারেল ভাবে চলছিল, ও রকম একটা পরিণতি তো হবেই।

দিল্লী-সিমলায় আমার দুর্নাম ছিল। স্ত্রীরা আমাকে দেখতে পারত না। স্বামীরাও আমাকে দেখতে পারত না, অনল। আজ তুমি মরে যাবার পর এ সব কথা বলছি আমি, বেঁচে থাকতে বলিনি। তোমাকে জেলাস করে রাখতে আমার এত ভালোই লাগত! আজ একটা সত্যি কথা বলি, ক্লাবে তোমার সামনে আমাকে নিয়ে কেউ আলোচনা করত না। কিন্তু নিজেরা যে কথা বলাবলি করত, তা তুমি জান না। ওরা বলত, মিসেস রায় ভেরি ক্লেভার ফ্লার্ট। সকলকে ভাঁওতা দেয়, লোভ দেখায়, কিন্তু ভালবাসতে দেয় শুধু অনল রায়কে। তোমাকে সত্যিই আমি ভালবাসতাম আমার সবটুকু দিয়ে। কক্ষনো তোমাকে স্বস্তি দেব না, ভালবাসাকে আটপৌরে হতে দেব না অনল, এই ছিল আমার ইচ্ছে।

আজও আমি তোমার মধ্যেই বন্দী হয়ে আছি। তোমার মধ্যে যতটুকু আমি, তোমার সঙ্গে যতটুকু, ততটুকুই জীবন্ত আমি। এখন যেমন, আমি জীবন্ত, কেন না তোমার কথাই ভাবছি। তোমার সঙ্গে কথা বলছি। বাকী সবটুকু যে আমি চলি ফিরি, সকালে চায়ের টেবিলে বসি, ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলি, অরফানেজে যাই, মেয়েদের হোমে, ক্লাবে, ব্রিজ পার্টিতে, ডগ-শো তে,—যে আমি হর্টি-কালচারের শো-এর জন্য রাক্ষুসে ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকা সূর্যমুখী ফোটাই —সে আমি তো মৃত।

সে আমি মৃত অনল, নীলের মা মরা মানুষ একটা, কলকাতার সব চেয়ে সোস্যালি অ্যাকটিভ মহিলা স্বাহা রায় একটা শবদেহ। অনল নেই বলে সে হাজারটা বাজে জিনিসে জীবন ভরে রেখেছে। সবাই বলে ব্রেভ ব্রেভ ওম্যান, গ্রেট কারেজ—

সবাই মিথ্যে কথা বলে। সাহস-টাহস নেই আমার। সাহস

থাকলে তো তুমি মরে যাবার পর আয়নায় মুখ দেখেই আত্মহত্যা করতাম। মমি কেমন করে তৈরি করত তাও জানি না। তাই যে-শরীর নিয়ে আমার গর্ব, যে-শরীর তোমাকে ছাড়া কাউকে জানে না, সে শরীরটা এমনি করে ভেঙেচুরে বুড়িয়ে যায়? যেতে দিই? যে আমি যৌবনের মন্ত্রে বিশ্বাসী, সেই আমি—?

বড্ড বুড়িয়ে গেছে বাড়িটা। আমার যৌবনের পুতুলটাকে আদর করে, সাজিয়ে আর কতদিন কাটাতে পারি বল? আমি তো বুঝতে পারি এ বাড়িটা কি চায়? প্রত্যেকটা ইট রাতে হিংস্র হয়ে ওঠে, আমাকে ভয় দেখায়। ওরা চায় এ বাড়িতে যৌবন আসুক, আবার আসুক। সেই জন্যেই তো নীল যাকে ভালবেসেছে, সেই মঞ্জীরাকে আমি আসতে দিইনি অনল। মঞ্জীরা তো যৌবন নয়, রূপ নয়, বয়স-হীনতার লাবণ্য নয়। নীল ওকেই নাকি সাত বছর ধরে ভালবেসেছে। আমি এক কথায় 'না' বলে দিই। যখন বলি, নীল তখন মাথা নীচু করে বসে ছিল।

আঃ, আমি তখন চেয়েছিলাম নীল এক মুহূর্তের মধ্যে তোমার ছেলে হয়ে যাক। ও যে পুরুষ, তা প্রমাণ করুক। তুমি তো এক সন্ধ্যা এক বিয়ে বাড়িতে দেখেই আমাকে বিয়ে করেছিলে।

তোমার দিদিমা রেগে যাননি? বলেন নি, তোর দাদামশায়ের খেতাব 'রাজা'। বড় বংশ থেকে বউ আনব? চাকুরে বাপের মেয়ে

আনব কেন? দেশে বড় ব শের অভাব আছে? তোব সঙ্গে মেযেব বিযে দিতে পাবলে কতজন, কত বাপ বর্তে যাবে?

তা বলে ঠেকাতে পেবেছিলেন তোমাকে? তুমি কাবো নিষেধ শুনেছিলে? আমি তো চাইছিলাম নীল বুঝুক, কত বড় সুযোগ আমি দিলাম ওকে। আমি ওকে উদ্ধত হবার, আমাকে তুড়ি মেবে উড়িযে দেবাব সুযোগ দিচ্ছি। ও বলুক আমাকে, না মা, মঞ্জীবাকেই বিযে কবব আমি। নইলে আমি বাচব না।

ইচ্ছে কবলেই পাবত। এম এ. হাবভাড, অনল বাযের ছেলে তুই। তোব দবকার কি তোব মাযেব অবফানেজ অ্যাসাইলাম-হোমেব হিসেব কষে-কষে মেপে মেপে বাচার? মঞ্জীবাকে বিযে কবতিস তুই। চাকরি খুঁজে নিতিস। আমাকে মুখে লাথি মেবে চলে যেতিস সুখ খুঁজে নিতে। আমাব কাছে তুই ভীরু, বিনীত, নম্র হযে থাকিস বলেই তো তোব ওপব আমাব স্নেহ আসে না। আমাকে নির্মম আঘাত কবলে আমি তখনি ভালবাসতাম তোকে। ওঠ শাণ, কোল বুঁজো, বুড়োটে মঞ্জীবাকেই সাজিযে আনতাম বউ করে।

নীল কি বলল জান? বলল, তাই হবে মা।

সত্যি বলতে কি, ওব কথা শুনে আমাব বুক নতুন কবে ভেঙে গিযেছিল। এমন নির্মম বাগ হযেছিল, মনে হযেছিল টুকবো কবে ছিঁড়ে ফেলি ওকে তখনি। আমি বললাম, তোব সাত বছবেব ভাল বাসা ভুলে যা। অমনি তুই মেনে নিলি সব? এক ছিটে পৌরুষ নেই তোর? ভালবাসা ভুলে দুঃখে পুড়ে পুড়ে বাচবি?

ওব চেযে বব মঞ্জীবাব সাহস ছিল। মঞ্জীবা তর্ক কবতে এসেছিল। আমাব দিকে আঙুল তুলে বলেছিল, বাক্ষুসী আপনি। ছেলেকে সুখী হতে দেবেন না। নিজেব দখল চলে যাবে বলে ছেলেকে বিযে করতে দিচ্ছেন না।

আমাব দুঃখ হযেছিল। যে কথা নীলের বলবাব কথা, তা মঞ্জীবা বলছে। মঞ্জীবা জানে ভালবাসতে গেলে লড়িযে, হিংস্র, উদ্ধত হতে

হয়। নীল তা জানে না। নীল মঞ্জীরাকে বিয়ে করছে না বলে আমারও দুঃখ হয়েছিল। মঞ্জীরা আমারি মত ব্যক্তিত্ব-প্রখর। নীলের মত কাপুরুষ, ব্যক্তিত্বহীন ছেলেকে ও চালিয়ে নিতে পারত।

চেহারা? তাও বিউটি ডায়েট-মাসাজ-ট্রিটমেন্টে বদলে দেওয়া যায়।

তবু আমি সে বিয়ে হতে দিইনি। কেননা মঞ্জীরার যে-ব্যক্তিত্ব আমার ভাল লেগেছিল, সেই ব্যক্তিত্বের ওপরই জ্বলে গিয়েছিলাম মনে মনে। আমার ওপর, সাহা রায়ের ওপর, কথা বলে চলে যাবে একটা সরকারী কেরাণী মেয়ে?

জান, আমি কি করেছিলাম ওকে? হাণ্টার মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলাম। চাবুকের ঘায়ে ওর হাত কেটে রক্ত পড়েছিল। ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল মঞ্জীরা। সেদিন বাড়ির ইটগুলোর হিংস্র হাহাকার যদি শুনতে। এ বাড়ির ইট-কাঠ-পাথর আসবাব-ঝাড় লণ্ঠন-কার্পেট সবাই অনেক বেশি রক্ত চায়, যৌবনতাজা রক্ত। তোমার দিদিমা তো বলতেন, তোমার দাদামশাইয়ের ফুর্তি করবার বাড়ি এটা।

তিনি বলতেন, বাড়িটার ভিতের নিচে বহু কান্না জমে আছে। তোমার দাদামশাই একবার এখানে এক জলসায় মদের নেশায় খেপে গিয়ে তাঁর এক বন্ধুকে গুলি করে মেরেই ফেললেন। তারপর নেশা ছুটে যেতে চাকর-দরোয়ানকে টাকা দিয়ে তাকে ভিত খুঁড়ে পুঁতে রাখেন। শুনেছি, কদ্দিন অব্দি সে লোকটির বউ স্বামীর খোঁজ করতে আসত। সে যে খুন হয়েছে, সে-কথা রটে গিয়েছিল। তবে তোমার দাদামশাই ছিলেন বিরাট ধনী। বড়লোকরা অমন খুন করতই, এখনো বোধ হয় করে। তা নিয়ে কোনো হইচই হয়নি।



এ বাড়িটার ইট-কাঠে সব কিছু হিংস্র আর ক্ষুধার্ত। রক্ত চায় ওরা। নইলে চায় সুখ শান্তি। এ বাড়িতে যারা থাকবে তারা যদি খুব সুখী হয় তাহলে এ বাড়ির ইট কাঠ গুনগুন করে সুখের গান গায়।

আমি প্রথম-প্রথম ভীষণ ভয় পেতাম। বাগানে যে চাঁপা গাছ দুটো আছে, তার পাতায় বাতাস বইলে মনে হত কারা যেন কাঁদছে।

তোমার দিদিমা বলতেন, বাগানে যাবি নাতবউ, চাঁপা গাছের নিচে কখনো যাস না।

চাঁপা ফুল দেখতে পারতেন না উনি।

পরে কারণটা জেনেছি। তোমার দাদামশাই তাঁর মেয়েমানুষদের এ বাড়িতে নিয়ে আসতেন। এমনিতে ফূর্তিই করতেন। যদি খবর পেতেন, তার মেয়েমানুষদের কেউ অন্য কারো ওপর মন দিয়েছে, তাহলে তাদের ধরে এনে নির্মম শাস্তি দিতেন।

খুনজখমও করেছেন। ওঁর টাকা ছিল, দাপট ছিল, যা ইচ্ছে তাই করে দিব্যি পার পেয়ে যেতেন। তেমনি দুটি মেয়েকে ধরে এনে খুন করে বাগানে পুঁতে তার ওপর তোমার দাদামশাই ওই গাছ দুটো লাগিয়ে দেন। তোমার দিদিমা বলতেন, এ বাড়িটা মাঝে-মাঝে কাঁচা বলি চায়। সব সময়ে প্রাণে মারতে চায় না। কিন্তু ভরা যৌবনে কারো সুখশান্তি নষ্ট হয়ে গেলে, ইটগুলো ঠাণ্ডা থাকে।

উনি তো তোমার মাকে নিয়ে একুশ বছরেই বিধবা। ওঁর সুখশান্তি বলি দিয়ে ইটগুলোকে ঠাণ্ডা রেখেছিলেন কিছুকাল। তোমার বাবা-মা একসঙ্গে কলেরায় মরলেন। তাতে ইটগুলো ঠাণ্ডা ছিল। তুমি মরলে আগুনে পুড়ে। আমার মুখের আধখানা গেল, জীবনের সুখশান্তি গেল, তাতে ইটগুলো ঠাণ্ডা ছিল।

কিন্তু এখন আর তাতেও হচ্ছে না, সবসময়ে ওরা নতুন-নতুন বলি চাইছে। অবুঝ কেন ওরা? দুর্দম? আমার যৌবন—সুখ-শান্তি—গ্যাসের আগুনের ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তোমার মৃত্যু—মৃত্যুতে সহসা রুদ্ধগতি তুমি, তোমার আশ্চর্য শরীর—এততেও কি তৃপ্তি হয় না?

না, ওদের হয় না। মৃত্যুশয্যায় তোমার দিদিমা ঘোলাটে চোখ তুলে বলেছিলেন, মাঝে-মাঝে রক্ত দিস এতোয়া। এই বিসরার বাবা এতোয়া। এতোয়া বলেছিল, হাঁ মাজী! এতোয়া মাঝে মাঝে কি পূজো করতো সাদা মুরগি কেটে, মুরগির মুণ্ডহীন শরীরটা ঘুরিয়ে কম্পাউণ্ডে রক্ত ছেটাতো।

এখন ছেটায় বিসরা। নীল সে কথা জানে কি না জানি না। বিসরা আছে বলে আমি বেঁচে আছি। ও জানে আর আমি জানি এ বাড়ির ইট-কাঠের রক্ত চাই।

বিসরা মুরগির গলা কেটে রক্ত ছেটায় এ কথা জানলেই সবাই শিউরে উঠবে। আজকাল দিনকালও তো অন্য রকম! জানলেই সবাই বলবে, এই দিনকালেও ডাইনি-পিশাচ কেউ মানে না কি? ইট-কাঠের কি প্রাণ আছে যে তাদের রক্ত-মাংস খেতে দিতে হবে?

বিসরাকে বলেছি, বিসরা রে! তুই অমাবস্যার আঁধার রাত দেখে পুজোটা করিস। কেউ যেন দেখতে না পায়, জানতে না পারে।

বিসরা নিজেই মুরগি কেনে, নিজেই পুজো করে। মুরগির গলা কেটে রক্ত ছেটায় আর বলে, খা খা! আবার পাবি।

বাগানের চাঁপা গাছ ছটোর গোড়ায় মুরগিটা পুঁতে দেয়। এগুলো কি কুসংস্কার? কিন্তু আমি জানি, পুজোর রক্ত-মাংস পেলে এ বাড়ির ইট-কাঠ বেশ কিছুদিন চুপ করে থাকে।

এখন কিন্তু ইট-কাঠ আর শান্ত হতে চাইছে না। ওরা আরো কিছু চায়। ভয়ংকর অশান্তি, দুঃখ, দুর্ঘটনা, কিছু ঘটুক এ বাড়িতে। শরীর মরে গেলে একরকম দুঃখ। প্রাণে বেঁচে অসুখী হলে সে দুঃখ আরো মর্মান্তিক। এ বাড়িটা কি চায় জান? যাদের যৌবন আছে, তারা এ বাড়ির পায়ে যৌবন-প্রেম-ভালবাসা বলিদান করুক।

কাকে বলব এ বাড়িকে তৃপ্ত রাখার জন্যে যৌবন নিয়ে এস? সর্ব সুখ দিয়ে যাও? তাই তো নীলকে বললাম সোনালিকে আনতে। লতিকাকে বলা ছিল, সুন্দর মেয়ে আরফানেজে এলে তাকে চোখে-চোখে রেখে বড় কোর। বয়সটা দেখো একটু। নীলের বউ হবে।

সোনালি, বেচারী সোনালি, কিছু জানে না ও। কেন অরফানেজে সব মেয়েদের চেয়ে বেশি যত্ন পেয়েছে, কেন আঠারো বছর না হতে লতিকা ওকে সঙ্গে নিয়ে বিউটি-পার্লারে গেছে। কেন ওকে নীলের বউ করে আনছি।

ও জানে না নীল একটা কাপুরুষ। আমি মনের চোখে একটি মেয়েকে দেখতে পাই অনল, সে আমার সেই স্বপ্ন অ-সম্ভবা নীলাঞ্জনা। আমার পঁচিশ বছর বয়সের পুতুলটা নিচের ঘরে আছে। সেই চেহারা নিয়ে তো একটি মেয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারত এ বাড়িতে? তা হল না বলেই আমার ওই লাইফ-সাইজ পুতুল গড়িয়ে রাখা। সোনালি যদি আমার মনের মত হয়, তাহলে পুতুলটা আমি ভেঙে ফেলে দেব।

নীল কি আমার মনের কথা বুঝতে পারে?

আমি ওকে চিনি না, ও আমাকে চেনে না, আজকাল, বহুদিন হল

ও যেন কেমন গোপনতাপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কি করে, কোথায় যায়, কিছুই বলে না আমাকে।

ও কেন এমন হল অনল? সেই দিল্লীতে ওকে দেখে আমি তো বিশ্বাসই করিনি ও আমার সন্তান। ভেবেছিলাম হাসপাতালে বদলে দিয়েছে।

খুব মজা পেয়েছিল সকলে। দিল্লীতে কত কথা উঠেছিল। মনে আছে? ও নাকি মোটে তোমার ছেলেই নয়। কালো-কুচ্ছিত ছেলে হয়েছে—আমার মন ভেঙেছে, তাতে সবাই খুশি হয়েছিল। নইলে অত দামী দামী প্রেজেন্ট হাতে মজা দেখতে এসেছিল ওরা? প্রতিভা দাশ আবার ন্যাকামি করে বলেছিল, প্রথমবার ছেলেই ভাল। পরে দেখো মেয়ে হবে। তখন কত ভালো লাগবে।

আমি তো জানতাম তোমার মনে ঘা লেগেছে সবচেয়ে বেশি। কালো মানুষ দেখতে পারতে না তুমি। কালোয় বড় ঘেন্না ছিল তোমার।

নীল, তোমার আত্মজ, ওর দিকে তাকাতে তোমার কষ্টই হত। আমারও হত। এ রকম হওয়া বোধ হয় খুব স্বাভাবিক নয়। যদি না হয় তা হলে মেনে নেওয়াই ভালো—আমরা সে অর্থে খুব স্বাভাবিক ছিলাম না। স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, এই সব সংজ্ঞার সঙ্গে কতকগুলো চেনা-চেনা ছবি আমাদের সংস্কারে ছাপ মেরে বসে আছে। আমরা তো সে সংজ্ঞার সীমানায় পড়ি না, তুমি আর আমি স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু সবাই বলত, দেখলে মনে হয় লাভার।

লাভারই তো অনল! বিবাহিত স্বামী স্ত্রী। কিন্তু যে প্রচণ্ড আবেগে দুজনে দুজনকে ভালবাসতাম, মনে হত যেন এই ভালবাসার সময়টুকু চুরি করে ছিনিয়ে নেওয়া বাঁধা সময়। খুব প্রচণ্ডভাবে প্রতিটি মুহূর্ত অসম্ভব প্রেম করে এই সময়টুকু নিঃশেষে ফুরিয়ে ফেলতে হবে। যেন প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে ভালবেসে নিতে হবে, কেন না দুজনকে চলে যেতে হবে দুই স্বতন্ত্র জীবনে। হুল্লোড়……

ভাগো অত ভালবেসে নিয়েছিলাম! তাই না। বত্রিশ বছরে তুমি

মরে গেছ। আমার বয়েস তখন আটাশ, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তোমার স্মৃতি আমাকে মাতাল করে রাখে, বাঁচিয়ে রাখে।

বত্রিশ বছর ছিল তোমার! নীলের বয়স তখন তিন। শীতে ছুটি নিয়েছিলে তুমি। আমরা এসেছিলাম কলকাতা। শীতের কলকাতা মানে তখন আনন্দ চারদিকে। আমি আর তুমি রাত চারটে শর্ন্দি ক্লাবে নাচতাম, মিডনাইট ডিনার পার্টি, ক্রিসমাস বল্, পয়লা জানুয়ারী স্টীমার ভাড়া করে হুল্লোড়······



আমি আব তুমি ফিরেছিলাম অনেক বাতে। হঠাৎ তোমার কফি খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। আমিই কিচেনে গেলাম, গ্যাস জ্বাললাম, কফি কবলাম। ব্ল্যাক কফি খেলাম দুজনে। কিন্তু অত ক্লান্তি কি কফিতেই সঙ্গে সঙ্গে কাটে অনল?

কফির মত কফি ফুরোল। হঠাৎ মনে হল বোধহয় গ্যাসের চাবি বন্ধ করিনি।

তুমি আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাচ্ছিলে।

আমি বললাম, এই! বোধ হয় গ্যাসের চাবি বন্ধ কবিনি।

তুমি বাতাস শুঁকলে। বললে, বন্ধ করেছ।

আমি বললাম, মা, করিনি!

তুমি বললে, গ্যাসের গন্ধ কোথায়? গ্যাস লিক করলে গন্ধ

পাওয়া যেত। যখন তা যাচ্ছে না, তার মানে গ্যাস লিক করছে না।

আমি বললাম, লিক করছে।

দুজনে হাসছিলাম, তর্ক করছিলাম। আর যখন তর্ক করছিলাম, তখনি পাইপের মুখ থেকে নিঃশব্দে গ্যাস বেরোচ্ছিল। শীতের জন্যে কিচেনের জানালা বন্ধ ছিল। গ্যাসের স্পাইরাল বাতাসে বিষ ছড়াচ্ছিল। আমরা হাসছিলাম। তুমি আমাকে একটা চুমু খেলে। বললে, যাও মুখ বন্ধ করে দিয়েছি। আর কথা বলতে পারবে না তুমি।

আমি বললাম, বা! গ্যাস যে খোলাই রইল।

তুমি বললে, আমি দেখছি।

আমি বললাম, আমি যাচ্ছি।

তুমি বললে আলো নিভিয়ে দিয়েছ। সুইচ জ্বালতে গিয়ে প্লাগে হাত দেবে।

আমি বললাম, দেশলাই জ্বেলে সুইচ দেখে নেব।

ইলেকট্রিকের শক লাগবে বলে আমার চিরকাল একটা ছেলেমানুষী ভয় আছে। আমি তাই দেশলাই নিয়ে হাসতে হাসতেই রান্নাঘরে গেলাম। হাসতে-হাসতে দেশলাই জ্বাললাম।

সর্বনাশের, যে সর্বনাশ মানুষের বিশ্বভুবন ভেঙে দেয়, তার এতটুকু আঁচ মেলে না কেন আগে? ভাগ্য কি মজা দেখে মানুষকে নিয়ে? তখনি সর্বনাশ হবে, মৃত্যু ফেলবে দীর্ঘ ছায়া আমার বাকী জীবনের ওপর। অথচ কিছুই জানি না আমি। পলকে প্রলয় হবে।

আমি দেশলাই জ্বাললাম……

সঙ্গে সঙ্গে বাতাস জ্বলে উঠল। আমি চেঁচাতেও পারিনি, বুঝতেই পারিনি কি হল। গায়ে উলের স্টোল ছিল। জ্বলে উঠল… কাপড় জ্বলছে…সব জ্বলছে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই…

তুমি ঢুকেছিলে, গ্যাসের চাবি বন্ধ করেছিলে, জানলার কাচ ভেঙে ছিলে, আমাকে টেনে এনেছিলে, সেই সঙ্গেই আগুন

নেভাচ্ছিলে তোমার কোট খুলে ঝাপটা মেরে মেরে। কিন্তু ভাঙা কাচ দিয়ে উত্তুরে বাতাসে বাতাসের আগুন ছড়িয়ে গেল, কিচেনের কাঠের তাক জ্বলতে শুরু করল। উত্তুরে বাতাস, গ্যাস, আগুন, আর ধোঁয়াকে ধাক্কা দিয়ে তোমার দিকে ঠেলে দিল।

তুমি আমাকে বাঁচাচ্ছ, ধোঁয়ার জ্বালা থেকে চোখ বাঁচাচ্ছ নিজের, শ্বাস আটকে যাচ্ছে তোমার, হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছ ঘন ঘন। আর গ্যাসের আগুনের বিষাক্ত ধোঁয়া ঢুকছে তোমার ফুসফুসে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত তখন রাক্ষস, তোমার প্রাণ, তোমার আয়ু কেড়ে নিচ্ছে তিল তিল করে। সময় কি আমাদের শত্রু ছিল অনল? কেন আগে তা জানতে দেয়নি? তখন যে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। একটু খোলা বাতাস পেলে তুমি বাঁচতে পার, ভেতরে নিঃশ্বাস টানো। ফুসফুস ধুয়ে যাক, নিশ্বাস ছাড়ো, বিষ বেরিয়ে যাক। কিন্তু তা হল না—

কিচ্ছু হল না অনল। কারবনিক অক্সাইডের চাপে তোমার সূর্যের মত প্রজ্বলন্ত রক্ত পাতলা হয়ে গেল, ফুসফুস আর মস্তিষ্ক ও সুষুম্না-কাণ্ড সস্নেহে ঢেকে রাখা ঝিল্লী নীরক্ত হয়ে গেল, ফুসফুসে থাইমাস্ গ্ল্যাণ্ডে তারস্থার রক্ত বিন্দু ফুটে উঠল, পেটের আন্ত্রর যন্ত্র কঁচকে গেল, সেখানে পেটেকিআল হেমারেজ, মস্তিষ্ক কঁচকে গেল, ফুসফুস রক্তশূন্য প্রায়, রক্তের ঘনীভবন বিলম্বিত, মন্থর। তোমার ভেতরে এমনি করে চলতে লাগল ভাঙাচোরা, আর তুমি আমাকে ডাকতে ডাকতে, 'শোনো, চোখ চাও। শোনো, চোখ চাও। শোনো চোখ চাও।' বলতে-বলতে বিস্ময়ে ভাবলে তোমার শরীর জড় হয়ে যাচ্ছে কেন।

তারপর লোকজন ছুটে আসে। আগুন নেভায়। তোমার সে সব কিছুই জেনে যাওয়া হল না।

তুমি মারা যাও সাফোকেশ্যনে। বাতাসে অক্সিজেন ছিল না। ঠোঁট, নখ, চামড়া কালচে-লাল হয়ে গিয়েছিল তোমার, সায়ানোসিস এসে গিয়েছিল। তোমাকে বাঁচাবে, না আমাকে, ভেবে পায়নি

ডাক্তার। দুজনকেই হাসপাতালে নেওয়া উচিত, সে সিদ্ধান্ত নিতে নিতেও ঘণ্টাখানেক দেরি হয়। অত রাতে ডাক্তার ডাকা, ডাক্তার এসে আমাদের দেখা, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সব তাতে সময় চলে গেল। বাড়িতে তো চাকর বাকর ছাড়া অন্য মানুষ ছিল না। তাদের পক্ষে ও রকম একটা এমার্জেন্সীর পরিস্থিতিকে আয়ত্তে এনে বুদ্ধিমত কাজ করা সম্ভব?

আমাকে তো কেউ বলেই নি তুমি নেই বলে। আমার জ্ঞান হবার পর যখন তোমার পিসতুত ভাই শংকরদাকে দেখলাম, তখনি বুঝেছিলাম সব। বুঝেছিলাম তুমি দিল্লী চলে গেছ, এ মিছে কথা। কাজের জন্যে ভারি পরোয়া কর তুমি। জরুরী কাজ আছে বলে ওই অবস্থায় আমাকে রেখে চলে যাবে এ অসম্ভব। বুঝেছিলাম সর্বনাশ হয়ে গেছে, আর সাত কুলে আমাদের কেউ নেই বলে মাদ্রাজ থেকে আমার দাদা এসেছে, লাহোর থেকে তোমার পিসতুত দাদা।

সবাই আমার দিকে করুণাভরে চেয়ে থাকত। কেন এই করুণা তা তখনো ভাল করে জানি না।

একদিন দেশাই, সেন, রঙ্গনাথ এদের দেখলাম। দিল্লী থেকে চলে এসেছে দেখেও কি আমার বুঝতে বাকী ছিল কিছু? কিছু বলিনি আমি। শুধু শংকরদা যখন বলত, অনল আসবে স্বাহা, আমাকে চিঠি লিখেছে, তোমার খবর নিচ্ছে, আমার মনে হত মানুষ এত বোকাও হয়? অনল আর আমার যা সম্পর্ক, তাতে আমি এ অবস্থায় হাস-পাতালে পড়ে আছি জেনেও অনল দিল্লীতে বসে থাকবে? শংকরদার সঙ্গে ওর দেখাই হয় না। আর সেই শংকরদাকে চিঠি লিখবে আমার খবরের জন্যে? মানুষ কি অসম্ভব বোকা হলে মনে করে এই সব আজগুবি কথা আমি বিশ্বাস করছি? একদিন আমি শুনলাম মা নার্সকে বলছে বাইরে দাঁড়িয়ে, ওই রূপই ওর কাল হল। জামাই মাথায় করে রাখতেন। হেঁটে গেলে বুক পেতে দিতেন, এখন কি হবে ওঁর? দু-দুটো সর্বনাশ সইতে পারবে?

ছু-ছুটো সর্বনাশ! মায়ের গলার আন্তরিক উদ্বেগে যে কোনো ফাঁকি নেই, তা বুঝতে আমার দেরি হয়নি। আমার মার পক্ষে কোনরকম ছলচাতুরি করা সম্ভব নয়। মা আবার বলল, এই যে ছেড়ে দেবে তোমরা, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ কি বলব? মা বোধ হয় ভাবছিল মার কাছে নিয়ে যাবে।

এর আগে বিয়ের পর একরাতও মার কাছে থাকিনি। সব সময়ে বলতাম, ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

মা বলত, ভারি নির্লজ্জ তুই। অমন করে বলে?

আমি বলতাম, সত্যি কথা বললে, নির্লজ্জ হয়ে গেলাম? ওকে ছেড়ে থাকতে পারি না তুমি জান না?

হাসপাতালে সেদিন দাদা বলল, স্বাহা, মাদ্রাজ যাবি?

আমি বললাম, কেন?

শংকরদা বলল, অনলও তাই লিখেছে·········

আমি বললাম, শংকরদা, ও কবে মারা গেছে?

শংকরদা আর দাদা কি ভীষণ চমকে উঠেছিল, আমার আজও মনে আছে। ছুজনে ছুজনের দিকে তাকিয়েছিল অসহায়ভাবে। কি বলবে ভেবে পায়নি চট করে। এ রকম পরিস্থিতিতে কথা বানিয়ে বলতেও সময় লাগে খানিকটা।

আমি বলেছিলাম, কথা বলছ না?

দাদা বলেছিল, কি বলব বল?

—ও কবে মারা গেছে?

শংকরদা বলেছিল, শোনো স্বাহা······

—শুনতেই তো চাইছি······

দাদা বলেছিল, সেদিনই। হাসপাতালে আনার আগেই······

—আমি আজ কতদিন হাসপাতালে?

—এগারো দিন।

এ-গা-রো-দি-ন!

—এগারো দিন।

আমি খুব সহজ আর স্বাভাবিক গলায় বলেছিলাম, কে সব করল-টরল দাদা?

দাদা বলেছিল, সব খুব ভাল ভাবে হয়ে গেছে। ও নিয়ে তুই ভাবিস না।

—আর কি হয়েছে দাদা?

—আবার কি হবে?

দাদা যেন নার্ভাস হয়ে চমকে উঠেছিল।

—আরো কিছু হয়েছে, তোমরা চেপে যাচ্ছ।

ওরা অজান্তে তাকিয়ে ফেলেছিল আমার গালের দিকে। তখনি আমি বুঝলাম, 'আরো যা হয়েছে' তা আমার মুখে। দুটো হাতই তখনো বিছানার সঙ্গে বাঁধা। মুখে কেন, শরীরেও তো নিদারুণ জ্বালা। আলাদা করে মুখের জ্বালা আমি টের পাইনি।

সেদিন আমি কিছু বলিনি ওদের।



বাচ্চা মত নার্স একটি, তাকেই ধমকে-ধামকে, মিষ্ট কথা বলে হাতের বাঁধন খুলিয়েছিলাম। আয়না আনিয়েছিলাম। ব্যাণ্ডেজ সরিয়েছিলাম, দেখেছিলাম।

আমার মুখের বাঁদিকটা পুড়ে, চামড়া কুঁচকে, বিকৃত হয়ে গেছে।

মুখ, আমার মুখ—যে মুখের ছবি দিয়ে বঙ্গের ফ্যাশন ম্যাগাজিনে বছরে দুবার মলাট হত, যে মুখের ছবির পাশে প্রাইজ পাওয়া ফুলের ছবি রেখে খবরের কাগজ ক্যাপশন দিত, কে বেশি সুন্দর?—আগুন সেই মুখ নষ্ট করে দিয়ে গেছে।

আশ্চর্য, আমার তখন দুঃখ হয় নি।

একটা অদ্ভুত আনন্দ হয়েছিল। অনলকে দিয়েছি আগুনকে, আমার রূপও দিয়েছি। অনল তুমি নেই, তাই অটুট রূপে দরকার নেই আমার, তখন এই মনে হয়েছিল।

মনের এক দুর্বল অবস্থার চিন্তা ওটা। কেন না, খানিকটা সুস্থ হতে না হতে অসাধ্য-সান্ত্বনা দুঃখে বুক পুড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ভবিতব্যের ওপর হাত তো থাকে না অনল। ক্রমে-ক্রমে আমি টিকে থাকার নিয়ম শিখেছি। বাঁচার টিকে থাকার, বিরুদ্ধ স্রোতের সঙ্গে লড়ে চলবার নিয়মটাই এমন, যে আমাকে হিংস্র করে তুলল।

হিংস্র জেদে আমি বাচতে থাকলাম। না, আর কোনদিন বিউটি কুইন হব না, আমার স্বর্ণাভ-লালচে চুল, কাশ্মীরী আনারের মত ঠোঁট, গোল্ডেন কুইন আপেলের মত বুক দেখে পাগল হবে না পুরুষরা। কিন্তু তাই বলে সিংহাসন ছেড়ে দেব? কখনো নয়। ওয়ান্স এ কুইন, অলওয়েজ এ কুইন!

সবাই ছুটে এল। দেবী গড়ের মহারাণী, যাঁকে তুমি "জ্যেঠিমা" বলতে, তিনি ছিলেন বিলেতে। বিলেত থেকে ফিরেই ছুটে এলেন আমার কাছে। বললেন, শোনো স্বাহা! বিলেতে চল। আজকাল ও দেশে অপারেশন হয়, তোমার মুখ আবার ঠিক করে দেবে।

আমি বললাম, বসুন জ্যেঠিমা।

তুমি চল স্বাহা।

না জ্যেঠিমা। অপারেশনে সব ঠিক হবে না।

তুমি আমার বাড়ি চল।

না, এ বাড়ি ছেড়ে যাব না।

ওঁকে বলতে পারি নি, নীলকে ছেড়ে যেতে আমার বুক ফেটে যেত বললে কি উনি বিশ্বাস করতেন? অনল, তুমি মরে যাবার পর সেই সময়টা নীল আমার কাছে খুব দুর্মূল্য হয়ে উঠেছিল।

বাড়িটাও হয়ে উঠেছিল প্রিয়। এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবার কথা ভাবতেই পারছিলাম না।

কোথাও গেলাম না। হাসপাতাল থেকে ফিরলাম এখানে। মুখ অপারেশন করাতে চাইলাম না।

তুমি নেই, কার জন্যে আমি মুখ অপারেশন করাব? আমাকে পুরুষরা এক সময়ে স্তাবকতা করত। সে আমার ভালই লাগত। কেন ভাল লাগত? তুমি জেলাস হতে, জেলাস হয়ে আমাকে আরো ভালবাসতে, তাই ভাল লাগত।

এখন তুমি নেই, তাই আমার নতুন করে সুন্দর হবার দরকার নেই।

আমি ঠিক করলাম, জীবনেও নিজেকে হারতে দেব না। যেমন করে হোক, দাপটে বাঁচব।

তাই এত রকম কাজকর্ম করেছি অনল। অরফানেজ চালাই, হোম চালাই, পঞ্চাশ-বাহান্নটা কমিটির মেম্বার, আরো অনেক রকম কাজ করি, যা তুমি সমর্থন করতে না। কিন্তু তুমি থাকলে তো আমি এ সব কোনদিনই করতাম না। অরফ্যুস আর ইউরিডাইসের মত, দেত্রঁ আর নাসাউয়ের মত, প্যারিস আর হেলেনের মত, অ্যান্টনি আর ক্লিওপেট্রার মত, আমরাও সময়কে বোকা বানিয়ে ইটার্নাল লাভার্স হয়ে থাকতাম।

তা তো হল না। আমি তাই এখন, কলকাতার সব চেয়ে সোস্যালি অ্যাকটিভ মহিলা। আমার ছবি যথেষ্ট বেরোয় কাগজে। ওরা ভদ্র, তাই ডান-দিকের ছবি নেয় শুধু। যারা জানে না তারা বলে, স্যু আর এ ব্রেভ ওম্যান।

এখনকার 'আমি' নামের শবদেহটা হাসে।

এ এমন ট্রাজিডি অনল, যে হাসি ছাড়া উপায় নেই, বেঁচে গিয়ে আমি মরে গেছি। মরে গিয়ে তুমি বেঁচে গেছ। চিরকাল তোমার বত্রিশ বছর বয়সই থাকবে। চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে সেই লালচে চুল, কটা চোখ, অজস্র ফর্সা র, পাথর পাথর বলিষ্ঠ রুক্ষ পৌরুষ, দুর্দম আবেগ, ক্ষমাহীন প্রেম।

তোমার ছেলে নীল তোমার চেয়ে বয়সে বড় হয়ে গেল।

অনল, এত দায়িত্ব দিয়ে গেছ আমাকে! এ বাড়ির ইটগুলো অবধি ক্ষুধার্ত হিংসায় সে দায়িত্বের কথা আমাকে মনে করিয়ে দেয়। তোমার দিদিমা-দাদু-মা বাবা তুমি— সকলের ছবি আমাকে অভিযোগ জানায়। আমি তোমার স্ত্রী। এ বাড়ির বউ হিসেবে আমাকে নিয়তি-নির্দেশিত এক ভূমিকা পালন করতে হবে।

নীল আর সোনালিকে বিয়ে দিতে হবে।

নীলকে সুখী করার জন্যে সোনালি আসছে না। আমাকে সুখী এবং তৃপ্ত করতে হবে। তার জন্যে ওকে অসুখী হতে হবে। নইলে আমি সুখী হব না। একা আমি সব দুঃখ-সুখের, যন্ত্রণার ভার টানব কেন? ওকে আমার যন্ত্রণার ছাঁচে ফেলে নতুন করে গড়িয়ে নিতে হবে। সেই জন্যেই নরম মাটির কাঁচা পুতুলের মত মেয়েটাকে বেছে নিয়েছি। ওকে একদিন স্বাহা বায় করে তুলব। তারপর আমিও নিশ্চিন্তে মরতে পারব। একমাত্র সেইদিনই আমার ছবিও নিচের ঘরে তোমার ছবির পাশে থাকবে। সেদিনই আমিও ছবি হয়ে যাব। অনল, আমি ছবি হতে চাই। কেননা ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত আমি।

সেই জন্যেই তো আগুন এত ভালবাসি। আগুনের সামনে বসে থাকি। নীল বলে, মা, এই গরমে আগুনের সামনে থাক কি করে?

নীল তো জানে না আমি মরে গেছি তোমারি সঙ্গে? এ আমি তো শবদেহ। শবদেহ তো ঠাণ্ডাই হয় অনল, প্রচণ্ড হিম।

কিন্তু আর না, তুমি এবার যাও অনল। নীল এসেছে। আমি গাড়ির হর্ণ শুনলাম।

স্বাহা রায় কালো বেনারসীর কুঁচি ঠিক করলেন। কালো বেনারসীতে রূপোর ফুল। তাই সর্বাঙ্গে আজ রূপোর গয়না। মাথায় রূপোর চন্দ্রমল্লিকা। তারপর স্প্রে করলেন গায়ে সো-রোজ। তীব্র সুগন্ধে ঘর ভরে গেল। দরজা খুললেন।

সিঁড়ি ধরে নামতে লাগলেন। মুখের একপাশ বিকৃত, কোঁচকানো, চোখের কোল নিচপানে ঝুলে নেমেছে। আরেক দিক সতেজ, চোখ প্রত্যাশায় স্থির, ঘাড় ও গলার রেখা এখনো সজীব।

—এসো সোনালি। নামতে নামতে স্বাহা রায় বললেন।

সেই দিন, সেই সন্ধ্যা

এসো সোনালি। স্বাহা রায় আবার বললেন।

সোনালি নীলের দিকে চাইল। নীল ওকে চোখ দিয়ে ভরসা দিল বোধ হয়। কেন না তখনি সোনালি এগিয়ে এসে স্বাহাকে প্রণাম করল। কালো ভেলভেটে কাচের টুকরো বসানো চটি ও বোধ হয় আগে কখনো দেখেনি।

নীল ওদের দেখছিল। ওর কপাল কুঞ্চিত রেখায়-রেখায়। বয়স সবে আটত্রিশ।

সোনালির বয়স বড় জোর চব্বিশ। কিন্তু সোনালিকে বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখায়। নীলকে দেখায় অনেক বড। যেন কিসের দুশ্চিন্তায় নীল সময় না হতেই বুড়িয়ে গেছে। চুলের দুপাশে পাক ধরেছে, চোখ চিন্তায় আর কিসের ভারে বিষণ্ণ। মুখ দেখলে মনে হয় না জীবনে হেসেছে ও।

--এসো আমরা বসি এখানে, আগুনের সামনে।

ফায়ারপ্লেসের গন্‌গনে আগুনের সামনে ওরা তিনজন বসলেন। নীল বসতে যাচ্ছে, স্বাহা বললেন, নীল! কাঠের টুকরিটা?

ছেলের সঙ্গে কথা বললেন, না চাকরের সঙ্গে, বোঝা কঠিন। কেন না গলায় যেন চাবুক ছিল। যেন কাঠের টুকরিট' এনে দেওয়া নীলের কাজ। নীল ওঁর দিকে চাইল। মার দিকে ও চায় যখন, চোখ হয়ে যায় ভাবলেশহীন, যেন ও কি মনে করল তা মাকে বুঝতে দেবে না বলে বহু প্রাচীন এক চ্যালেঞ্জ আছে ওর। এত প্রাচীন, যে এখন মার দিকে নিরনুভূতি চোখে চাওয়া নীলের অভ্যেস হয়ে গেছে।

নীল বলল, হাতের কাছেই আছে।

-- হাতের কাছেই?

—হ্যাঁ, রোজই থাকে।

সোনালির মনে হল কথাগুলো খুব তুচ্ছ। মা-ছেলের কথা কিন্তু এর নিচে নিচে যেন অন্য কোন বিদ্বেষের প্রখর স্রোত আছে। স্বাহা কলকলিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, তাই তো! দেখতেই পাইনি।

যেন স্বর্গের অপ্সরা নক্ষত্রগুলি ছিটিয়ে দিচ্ছে সন্ধ্যার আকাশে এমনি ললিত ভঙ্গীতে স্বাহা বাস্কেট থেকে কুচি কুচি কাঠ নিয়ে ফায়ারপ্লেসের আগুনে ফেলতে লাগলেন।

সোনালি অবাক হয়ে একবার মাকে দেখছিল, একবার ছেলেকে। স্বাহা হাসতে হাসতেই বললেন, নীল আমার এই কাঠ জ্বেলে আগুন জাগিয়ে রাখার ব্যাপারটা পছন্দ করে না।

নীল একটু ঝুঁকল। মাকে একটা এলাচ দিল।

স্বাহা তেরো বছরের অভিমানী মেয়ের মত ঘাড় বেঁকালেন। তেষট্টি বছরের চামড়া কুঁচকে দলা পাকিয়ে উঠল। স্বাহা বললেন, ডিয়ার, আমার মুখে কি গন্ধ বেরোচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—ও! নীল, নীল, নীল!

স্বাহা নীলের অনিচ্ছুক গালে টোকা দিলেন। সোনালির দিকে ফিরে বললেন, সন্ধ্যে বেলা একটা টনিক খেতে হয় আমাকে। টনিকের গন্ধ ভারি বিচ্ছিরি। তাই নীল এলাচ দিল।

সোনালি কি বলবে ভেবে পেল না। তবে এটা ও বুঝতে পারছিল, মা ও ছেলে যা-যা বলছেন, যা-যা করছেন, তা যেন কোনো পুরনো লড়াইয়ের বিদ্বেষী মামলার জের টেনে চলার ব্যাপার। এত নতুন লাগছিল ওর, ও শুধু চেয়ে থাকতে পারল। এই বাড়ি এই পরিবেশ, এ বাড়ির একমাত্র ছেলের ওকে বিয়ে করতে চাওয়া, স্বাহা রায়কে সামনাসামনি দেখা, সোনালির মাথা ঝিমঝিম করছিল। এত অবিশ্বাস্য ঘটনা ওর জীবনে ঘটছে?

স্বাহা ওর দিকে ঝুঁকে বললেন, লক্ষ্মী সোনা মেয়ে! নিজে থেকে কি—ছু জানতে চেয়ো না।

—কি জানতে চাইব?

সোনালি ভীরু ও কাতর প্রশ্ন করল। স্বাহা রায় স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক, ছেলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক মা ছেলের না আজন্ম শত্রুর তা ভাবার ক্ষমতা ওর নেই। ও এক নির্বিষ সাপ, শঙ্খচূড়ের আহার হবার জন্যে ওর জন্ম। শঙ্খচূড় যেমন নির্বিষ সাপকে অমোঘ টানে টানতে থাকে, তেমনি করে স্বাহা ওকে টানছেন—টানছেন—টানছেন।

স্বাহা তা বুঝতে পারছেন। প্রগল্‌ভা কিশোরীর মত বলে চললেন উনি, নীল কেন আমার আগুন-ভালবাসা দেখতে পারে না, সেই কথা?…আগুন থেকে কত কি হতে পারে!

সোনালি চোখ কান বুজে বলে ফেলল। -কি হতে পারে? অঁ্যা? কি হতে পারে আগুন থেকে?

নিমেষে স্বাহা ক্রোধে ভয়কর হয়ে উঠলেন। নীলের দিকে আঙুল তুললেন।

—তুমি বলে দিয়েছ ওকে?

– না।

— তবে ও কেন ও কথা বলল?

—খুব স্বাভাবিকভাবেই বলেছে মা!

- -সোনালি, তুমি বল। আগুন থেকে কত কি হতে পারে মানে কি? কি বলতে চাইছ তুমি!

—দু-র্ঘ ট-না। সোনালি থেমে থেমে, ভয়ে ভীরু শেফালির মত ঝরে পড়তে-পড়তে কোনমতে বলল।

স্বাহা নিমেষে কচি হয়ে গেলেন। এখন উনি পাঁচ বছরের মেয়ে। নীলের দিকে চেয়ে চুনি-মুক্তো-গোমেদ-হীরে-নীলা-পান্না-ওনিক্‌স্-ওপেল আট আঙুলের আটটা ধারণ করা আংটি ঝলসে বললেন, বল, বলে দাওনি? সত্যি কথা বল?

—না বলিনি।

খুব খুশি হলেন স্বাহা। নিশ্চিন্ত হলেন যেন। এবার তেষট্টি বছরের বয়সোচিত গলায় আর ভঙ্গীতে বললেন সোনালিকে, ওই আগুনের কথাটা হল আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা। ও কথাটা আমি কাউকে বলতে দিই না। আমি নিজে বলতে চাই।

—বলুন? সোনালি আবার আকৃষ্ট হচ্ছে।

স্বাহা হাসলেন, বললেন, নীল তোমার দিকে চেয়ে আছে কেমন করে দেখ? কি সিম্প্যাথি আর পিটি ওর চোখে। নীল কি ভাবছে আমি বলে দিতে পারি। তোমাকে বাঁচিয়ে দিতে চাইছে ও। ওর তো আমার কথায় 'না' বলার সাধ্যি নেই? ও চাইছে আমি তোমাকে সেই আগুন নিয়ে কথাটা না বলি। ও চাইছে, তোমার আমাকে ভাল না-লাগুক। ও চাইছে, তুমি বল ওকে বিয়ে করবে না, তাই না নীল?

নীল মার দিকে চাইল না। চিন্তার যেন প্রাচীন কোনো স্থায়ী দুশ্চিন্তায় আবার গম্ভীর হয়ে গেল ওর চোখ। পকেট থেকে পাউচ বের করল ও। পাইপে তামাক ভরল।

স্বাহার মুখে অসন্তোষ ফুটে উঠল। যেন খুব সহজেই জিত হয়ে গেল ওঁর, কেন না নীল একটি কথাও বলল না। কিন্তু এত সহজে জিত উনি চাননি। নীল যেন ওকে বিনা যুদ্ধে জিতিয়ে দিয়ে মজাটা পেতে দিল না। সহজে টেক্কা নিতে দিল।

কিন্তু গল্প বলার সময় চলে যায়। স্বাহা সোনালির নিষ্পাপ বিশ্বাসী চোখ দুটিকে নিজের চোখে বিঁধলেন। ওঁর চোখে কনটাক্ট লেন্স, সোনালি বোধ হয় তা বুঝতে পারেনি। পারবে কোত্থেকে। সাতদিন বয়েস থেকে অবফানেজে মানুষ। কি দেখেছে যে কনটাক্ট লেন্স কাকে বলে তা বুঝবে?

কিন্তু সোনালির চোখ কি উজ্জ্বল, চামড়া কি মসৃণ, চুল কি কালো। স্বাহার হিংসে হল। অসম্ভব কান্না পেল। কেন সোনালি

অমন উজ্জ্বল, তরুণ, সজীব ? তিনি কেন অপচিত, জীর্ণ, রুক্ষ, হিংস্র ? কেন ও নীলের মত একটা অপদার্থের দিকে মাঝে মাঝে বিস্মিত মুগ্ধতায় চাইবে ? যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছে ? কেন ওকে সুখী-সুখী, স্বপ্ন বিভোর দেখাবে ?

সোনালি ভাবছিল অরফানেজ মানে তো অন্ধকারে ঘুমোতে ভয়, মা বাবা ভাই বোন কথাগুলো চিরকাল অচেনা থাকা, চেয়ে আনা বেঢপ জামা কাপড় পরতে পরতে একবার একটা নিজের মাপের নতুন জামার জন্যে, ভগবানকে ডাকা শোবার আগে, ভূতের ভয়ে ছোট্ট বালিশে কচি আঙুলে রাম-নাম লিখে ভরসা খোঁজা। সকালে পাঁউরুটি-চা, দুপুরে ডাল-তরকারি-ভাত, বিকেলে কিছু না, সন্ধ্যে সন্ধ্যে রুটি তরকারি খেয়ে বড় হওয়া আর ইস্কুলে যাবার পথে ঝরঝরে বাস থেকে মিষ্টির দোকানের দিকে লোভী চোখে চেয়ে থাকা।



অরফানেজ মানে মাথায় নারকেল তেল, গায়ে ওষুধ-গন্ধী সাবান মেখে বড় হতে হতে পৃথিবীর সব সুগন্ধি প্রসাধনীর স্বপ্ন দেখা, অসুখে একটা সর্বরোগহর মিক্সচার খেতে খেতে মাথায় কারো নরম আঙুলের ছোঁয়া-চাওয়া।

প্রমোদ মানেই ছাদে বেড়ানো, আর বেড়াতে বেড়াতে সিনেমা-থিয়েটার-জলসা-পুজোর ভিড়ের জন্যে মনে মনে কেঁদে মরা।

অরফানেজ মানে চিরতরে পাঁশকুড়নী হয়ে থাকা, কোনোদিন কাচের চটি পরা সিণ্ডারেলা না-হওয়া।

কিন্তু পরীরাণীর মত লতিকাদি একদিন সোনালিকে কাছে ডাকলেন। করুণ মমতায় চাইলেন সোনালির দিকে।

সেদিন ওঁর বাথরুমে সোনালি শ্যাম্পু দিল চুলে, গায়ে সুগন্ধি সাবান মেখে স্নান করল, সুন্দর আর নতুন জামাকাপড় পরল। চুল শুকিয়ে বেনী বাঁধল, নতুন স্নোর শিশিতে আঙুল ছোঁয়াল স্বপ্নে, নিজের মুখ দেখল আয়নায়।

সেদিন ও ট্রেনিং কলেজে গেল না। লতিকাদির ঘরে বসে আলাপ করল নীল রায়ের সঙ্গে।

নীল রায়! স্বাহা রায়ের ছেলে! ওদের অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা, পালয়িতা, ওদের আকাশের অদেখা সূর্য নীল রায়।

লতিকাদি বললেন, সোনালি, ইনি নীল রায়।

জানি।

জানবেই তো। নীল, এই সোনালি।

নমস্কার।

নমস্কার।

আপনার নামটা পুরো কি?

সোনালি বসু।

লতিকাদি বললেন, নাম আর পদবী তো আমরাই দিই। দেখেই বুঝতে পারছ সোনালি ভাল ঘরের মেয়ে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই···আচ্ছা, আপনি কি করতে ভালবাসেন? মানে, কি করেন?

আমি?

লতিকাদি তাড়াতাড়ি বললেন, সোনালি বি. এ. পাশ করার পর থেকে আমাদের স্কুলে পড়াচ্ছে।

কি রকম লাগে পড়াতে?

ভাল লাগে বেশ।

ঘরসংসারের কাজ করতে হয় না, বেশ মজা।

বা, কত কাজ করি তো।

লতিকাদি বললেন। আমাদের ছোট বাচ্চাদের ক্রেশের সব কাজ তো ও একাই করত।

কি ভাল লাগে, বললেন না?

সোনালি ফশ করে বলে ফেলল, বেড়াতে।

কোথায়?

কেন? কলকাতায়?

কলকাতায়?

বাঃ, কত দেখার জায়গা আছে না? ভিক্টোরিয়ার ভেতরটা দেখব কত দিনের শখ। নিউ মার্কেটও দেখিনি।

নীল ওর দিকে হঠাৎ খুব বিস্মিত, ব্যথিত চোখে তাকাল। তারপর বলল, বেশ তো! একদিন গেলেই হবে।

নীল চলে গেল।

সোনালি জানে নি, সেদিনই লতিকাদি স্বাহা রায়কে ফোন করেন, খুব চিন্তিত মুখে।

আমি লতিকা বলছি।

বল লতিকা।

নীল এসেছিল।

জানি।

কথাবার্তা বলল ওরা।

কি মনে হল?

সোনালির খুব ভালই লেগেছে ওকে।

আঃ! লতিকা!

বলুন।

সোনালি কে? অরফানেজের ছুঁড়ি একটা। সে কি দেখেছে

জন্মে? নীলকে ওর ভাল লাগবেই নীলের ভাল লেগেছে কি? তাই জিগ্যেস করছি।

তাই তো মনে হল।

নীল আবার যাবে?

মনে হল আসবে আবার।

যাক্। ভালয় ভালয় বিয়েটা হলে হয়।

হ্যাঁ।

লতিকাদি ফোন নামিয়ে রেখে ঘাম মুছেছিলেন। স্বাহা রায় ইচ্ছে করলে কলকাতায় যে কোন মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সোনালিকেই বেছে নিলেন উনি। কেন? লোকের সামনে প্রমাণ করতে হবে উনি সত্যিই খুব উদার? অন্য কোন মতলব আছে? লতিকাদি স্বাহা রায়কে ভীষণ ভয় করেন। সবদা মনে হয় উনি যা করছেন, তার পেছনে অন্য কোন গোপন অভিসন্ধি আছে।

আবার একদিন নীল এল। দুপুরবেলা সোনালিকে নিয়ে গিয়ে ভিক্টোরিয়ার মিউজিয়াম দেখিয়ে আনল।

আরেকদিন এল। সন্ধ্যেবেলা। বলল, চল সোনালি একটু বেড়িয়ে আসি।

“তুমি” শুনে সোনালির বুকের নিচে বড়াস করে উঠেছিল। ও বলেছিল, কাপড়টা বদলে আসি।

কি দরকার? এমনিই চল।

তারপর নীলের সঙ্গে স্বপ্নে হেঁটে এক গাড়িতে ওঠা, গড়ের মাঠে গাড়িতে বসে কথা বলা। সোনালির ভয়, লজ্জা, কুণ্ঠা, অবিশ্বাস নিজের ভাগ্যে।

কিন্তু নীলের গলায় ক্লান্ত, করুণ মিনতি। সোনালি তুমি ভয় পেও না। আমি তোমার অনিষ্ট করব না।

সোনালি মুখ তুলে তাকিয়েছিল। নীলের চোখ, নীলের চোখ। সমুদ্র সমুদ্র ক্লান্তি, চিন্তা, দুঃখ সে চোখে।

নীল বলেছিল, আমি বড় ক্লান্ত সোনালি। বড় একা। আমার তোমাকে খুব দরকার।

তখনি সোনালির মনে কি প্রগাঢ়, দুর্বার মমতা। কিছুই জানে না ও, শুধু মনে হল নীল ওকে চায়। একবারও ও বলতে পারল না, আমাকে কেন? কত মেয়ে তো ধন্য হয়ে যাবে তোমাকে পেলে?

নীল বলেছিল, তুমি মাকে দেখনি, মা তোমাকে দেখেছেন। [illegible] তোমাকে চান।

সোনালি এত অবাক হয়েছিল যে কিছুই বলতে পারেনি।

নীল বলেছিল, আমি তোমাকে এইটুকু দেখেই বুঝেছি, তোমাকে পেলে আমার অনেক প্রাপ্তি হবে। কিন্তু তুমি তো বলবে না, এখন মনে হচ্ছে আমাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে না। তুমি ইচ্ছে হলেই 'না' বলতে পার। আমি মাকে বলব, সোনালি রাজী হয়নি।

সোনালি সকল কথাই বলেছিল, তা তো সত্যি নয়।

—কেন নয় সোনালি?

—আমি তো না বলিনি।

—বলনি, বলতে তো পার।

—কেন বলব?

—না, 'হ্যাঁ' বলবেই বা কেন?

—কেন বলব না?

নীল অবাক হয়ে সোনালিকে দেখছিল। বলেছিল, তুমি না বি এ. পাশ করেছ?

—করেছি তো।

—তবে এত বোকা কেন?

—বোকা হলাম কিসে?

মমতায় মৃদু গলায় নীল বলেছিল, আমি তোমার চেয়ে বয়সে কত বড়। আমি কি রকম মানুষ তাও তো জান না।

—সেদিন যখন আলাপ করলেন, তখন বয়স কি কম হ'য়ে গিয়েছিল ? নিজের বয়স জেনেশুনেই তো······

—বা, তুমি তো বেশ যুক্তি দিয়ে তর্ক করতে পার ?

—পারিই তো।

—আমি কেমন মানুষ, তাই কি তুমি জান ?

সোনালি বলে ফেলেছিল, যার ও রকম চোখ সে কখনো মন্দ হতে পারে ?

—ক রকম চোখ ?

—জানি না।

সোনালি আর কথা বলেনি। নীল পাইপে তামাক ভরে ...ল। পাইপ টেনেছিল। তারপর বলেছিল, তুমি ভাব সোনালি, সময় নাও। তবে একটা কথা রেখো। মার কাছে আমার প্রশংসা কখনো করো না, কখনো নয়।

—কেন ?

—মার কাছে আমি একটা অপদার্থ।

—বা! তাও কি হয় ? আপনার তো কত সুনাম আমাদের ওখানে।

—খব সুনাম ! কি বলে সবাই ?

—বলে, আপনার অহংকার নেই, মনটা কত বড়।

—মা তা ভাবেন না।

—কেন ?

নীল হঠাৎ হেসেছিল। বলেছিল, পরে শুনো।

—আপনার চোখ অত লাল কেন ?

—রাতে ঘুমোই না বলে বোধ হয়।

—রাতে ঘুমোন না ? কেন ?

—রাতে ঘুম আসে না।

—কি করেন ?

—বই পড়ি। ভোরে ঘুমোই।

—কবে থেকে ?

—বরাবর।

—মা কিছু বলেন না ?

—জানলে তো।

—জানেন না ?

—না।

—সে কি !

এব গণ্ডগোল লাগছিল সোনালির। মা থাকা মানে তো সব থাকা। মা থাকতে ছোটবেলা থেকে কেউ না ঘুমিয়ে রাত কাটায়, আর মা সে কথা জানতে পারে না ?

নীল যেন হঠাৎ মনস্থির করে বলেছিল, আমি যে তোমাকে এ কথা বলছি, তা মাকে বোল না।

—বলব না।

—ছোটবেলা থেকেই একা ঘুমিয়েছ তো ?

—নিশ্চয়।

—ভয় করত না ?

—ভীষণ।

—তখন কি করতে ?

—কেন, বালিশে রাম-নাম লিখতাম।

—এ্যাঃ, এটাই তো জানা ছিল না।

—আপনি একা ঘুমোতেন ?

—নিশ্চয়।

—ভয় পেতেন বুঝি ?

—ভীষণ।

—ঘরে কেউ থাকত না ?

—আয়ার থাকার কথা। চলে যেত।

—মা জানতেন না ?

—উনি তো অন্য মহলে থাকেন। আমার সঙ্গে ওঁর দেখা হত নাকি? তিন বছর বয়েস থেকে দশ বছর বয়সের মধ্যে কদার উনি কাছে ডেকে কথা বলেছেন, হাতে গুনতে পাবি।

—আপনি কার কাছে থাকতেন?

—ঝি চাকর-আয়া। আসলে---

—আসলে কি?

—একা থাকতাম। নিজের সঙ্গে।

—সেই থেকে রাত জাগা অভ্যেস?

—প্রথম প্রথম ভয়ে ঘুম হত না। পরে ওটাই অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায়। এখন তো রাতের ঘুম ভুলেই গেছি।

—খাওয়া দাওয়া স—ব ওদের কাছে?

—নিশ্চয়।

—মা গো।

—তখন থেকেই তো, মানে একটু বড় হয়ে থেকে নিজে চা করি, নিজে কফি করি, নিজের ব্রেকফাস্ট নিজে করে নিই।

—অন্য খাওয়া দাওয়া?

—বছর চারেক হল প্রোমোশন হয়েছে। ওর সঙ্গে এক টেবিলে দিনে আর রাতে খাই।

—সত্যি।

—কি, অবাক লাগছে?

—হয়তো উনি খুব ব্যস্ত থাকতেন, তাই·· ···

—না না না! নীল হেসেছিল। বলেছিল, আমার বাবা পুরুষের মত পুরুষ ছিলেন। ঘোড়া চড়তেন, মোটর রেস করতেন, শিকার করতেন। আমি তো বাবার রূপ গুণ পাইনি। মা আমাকে আলাদা-আলাদা রেখে শক্ত সমর্থ পুরুষ তৈরি করেছিলেন।

—তাই?

—বিসরা তাই বলে।

—বিসরা কে ?

মার ডান হাত বলতে পার।

—পুরনো লোক ?

—খুব পুরনো।

মায়ের বিশ্বাসী বুঝি খুব ?

- খুব। মা বললে ও মরে যেতে পারে।

তাই ?

—হ্যা, আমার চেয়ে মা ওকে অনেক বেশি বিশ্বাস করেন।

-আপনার চেয়ে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার চেয়ে তোমাদের লতিকাদিকেও বেশি বিশ্বাস করেন। কিন্তু সোনালি, আসল কথা ভুলে যেও না। তুমি সময় নাও, ভেবে দেখ। এখনি কিছু বলতে হবে না।

- আমার ভাবা হয়ে গেছে।

— কি ভাবলে ?

আগেই তো বলেছি।

সোনালি, তুমি এত কথা বলতে পার ?

—কেন পারব না ?

যদি তোমাকে অসুখী করি ?

- -তা কেন করবেন ?

আমার যে ভয় হয়।

সোনালি হঠাৎ যেন খুব সাহস পেয়ে গিয়ে হাতে হাত রেখেছিল। বলেছিল, ভয়ের কি আছে ?

অবফানেজের মেয়েরা বিয়ে হলে হাতে সবাই স্বর্গ পায়। সোনালি সে অর্থে স্বর্গ তো পেয়েইছিল, তার চেয়েও বেশি যা মনে আসছিল— প্রত্যাশিত বৃষ্টির মত- তা হল মমতা।

আজ, এখানে আসার আগে সোনালিই নীলকে বলেছিল, সব ঠিক হয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই, অবফানেজ মানে সব কিছু অজ্ঞান

ফেলে দেওয়া জিনিস কুড়িয়ে পাচ্ছে। সেখানে নীল তাকে বিয়ে করতে চাইছে, নিজের মত করে এই প্রথম কোনো কিছু হাতে পাচ্ছে সোনালি।

সোনালির তো মনে হয়েছিল এর পিছনে ডাক্তার বাবুর কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে। নইলে অরফানেজের মেয়ে সোনালির সঙ্গে ধাপা বাবুর ছেলে নীল বাবুর বিয়ে ঠিক হয়?

মনে মনে ও সাহস পাচ্ছিল ও কোথা থেকে। বাবা যেন ওকে ভরসা দিচ্ছিল। ডাক্তার বাবুর মুখোমুখি হতে ভয় পান।

কিন্তু এ বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই ও বিবশ, দুর্বল, মন্ত্রমুগ্ধ। নীল বাবার কথা, যা বলেছেন সব সত্য নিশ্চয়, কেন না নীল তো মিথ্যা কথা বলে না। তবু [illegible] বায় আশ্চর্য, তুলনা।

নীলের চোখ গম্ভীর হয়ে গেল, নিশ্বাস ফেলল ও। বুঝে। সাপধরা যন্ত্রণাতে বাবা [illegible], হাতে চাকা [illegible] কঠিন থেকে কঠিনতর, নির্মম থেকে আরো নির্মম, নির্মম থেকে নির্মমতর হন, এখন এমন হচ্ছেন, সোনালিকে বিষাক্ত করছেন মাইক্রোস্কোপে [illegible], নীলের বুক ভেঙে [illegible]। সাহস [illegible] পেল। [illegible] বিসাট [illegible] অভিশাপ।

ডাক্তারবাবুর হাতে একটি গাছও বাঁচে না কোনোদিন। নীল তার হাতে এনে দিয়েছে সোনালির মত একটি নিষ্পাপ মেয়েকে। ডাক্তারবাবুর কোন বিকৃত, অদ্ভুত ইচ্ছা পরশের জন্য। নীল ওকে চায় নিজের জন্যে। কিন্তু নীল জানে ওর রক্তে আছে অভিশাপ ডাক্তারবাবুর ছেলে কোন মেয়েকে সুখী করতে পারে না। সেইজন্যেই ও যখন মঞ্জরীকে ভুলে যেতে বলেন ও বলেছিল, ওর বুক ভেঙে যাবে কিন্তু মঞ্জরী বেঁচে যাবে।

অথচ সোনালিকে ও বাঁচাতে চাইছে না কেন? কেন সোনালিকে টানছে ওর অভিশপ্ত জীবনে? কেন সোনালিকে বলছে না, তোমার দুঃখ তোমার পিতৃ মাতৃ পরিচয় নেই। আমার দুঃখ আমার পিতৃ-মাতৃ

পরিচয় এত বড়, এত ভার তার, যে আমি সব ভুলে, সব ভার ফেলে দিয়ে নিষ্পরিচয় হতে পারলে বাঁচি। তাহলে আমি মরি না।

তা বলছে না কেন নীল? স্বাহা রায়ের দিকে মন্ত্রমুগ্ধচোখ সোনালিকে দেখতে দেখতে নীল বুঝল, ও সোনালিকে চায়। সোনালির ওপর কোন বংশ, আভিজাত্য, ঐতিহ্যের ভার নেই। ওর মনে মমতা আছে। ওকে পেলে নীল হয়তো মার সঙ্গে শেষ যুদ্ধটা লড়তে পারে। হয়তো (সে সৌভাগ্যের কথা ভাবতেও ভয় করে) জিতেও যেতে পারে।

হয়তো দেখা গেল নীল আর সোনালি, নীল আর সোনালির মত করে সুখী হল। অনল রায় আর স্বাহা রায়ের মত করে জ্বলল না, আর জ্বালাল না। সে চিন্তাতেই ভরসা পেল নীল। ও চিন্তাকুল চোখে পাইপে তামাক ভরল। লাইটার জ্বালাল।

স্বাহা রায় আবার বললেন, সোনালি, নীল চাইছে, তুমি বল ওকে বিয়ে করবে না। তাই না নীল?

নীল ওর দিকে চাইল না। কিন্তু সমস্ত ইচ্ছাশক্তি এক করে সোনালিকে ভরসা দিল মনে মনে। সোনালি, বিবশ হয়ো না, ভয় পেও না, হার মেনো না ওই মতিমতী অশুভের কাছে। আমি তোমাকে ভালবাসি কি না জানি না, ভালবাসা শব্দটিতে আমার বড় ভয়। ভালবাসা মানে অনল স্বাহার ভালবাসা। এ বাড়িটা সেই ভয়ংকর ভালবাসার তিক্ত তার জীবন্ত অনুভূতির মিউজিয়াম। ভালবাসব কিনা জানি না, তবে মঙ্গল চাইব, তোমার মঙ্গল চাইছি আমি এখনি।

নির্ভার হয়ে যাচ্ছে নীলের মন, চাপ নেমে যাচ্ছে বুক থেকে। এই প্রথম নীল, বাপ-মা নিজে, এই ত্রিভুজের বাইরে আরেক জনের কথা নিঃস্বার্থে ভাবতে পারল।

নীলের ইচ্ছার অত্যুগ্র তীর বোধ হয় সোনালিকে বিঁধল। ও হঠাৎ চোখ তুলল স্বাহা রায়ের দিকে। বলল, আগুনের কথা কি বলবেন বললেন যে?



শাহা রায়ের গলায় হঠাৎ রোমাঞ্চ ও শ্বাস-উত্তেজনার নাটক সঞ্চার হল। এখন উনি অভিনেত্রী—সম্রাজ্ঞী। এ ঘরটি তাঁর মঞ্চ। সোনালি তাঁর অগণিত মুগ্ধ দর্শক ও শ্রোতা। শাহা রায় থিয়েটারের রানী সারা সিডনস হয়ে গেলেন। উনি এখন লেডি ম্যাকবেথ। ওঁর ইচ্ছায় প্রেত মৃত্যু যুদ্ধ রক্তপাত ঘটবে, বন অরণ্য সচল হবে, প্রেতলোকের বাসিন্দারা জীবন্ত হবে।

শাহা রায় বললেন, আমার মুখের এ দিকটা দেখছ? মুখ ফেরালেন সোনালির দিকে। ওর আঙুলের চাপে এম্পায়ার চেয়ারের পিছের বাঁ দিকে একটা পেখর আলো জ্বলল। বাঁ মুখের বীভৎস পোড়ার দাগ নাটকীয়ভাবে আলোকিত হল। এই আলো জ্বেলে এই ক্ষতচিহ্ন নগ্ন করে শাহা দেখাচ্ছেন, লোককে শিউরে দিয়ে মজা পাচ্ছেন। এ দৃশ্য নীল কতবার দেখেছে? এতবার যে আর মনে পড়ে না।

সোনালি দেখেছে আগেই। শাহা রায়কে দেখলে মুখের ক্ষতচিহ্নটা না দেখে উপায় নেই। এক সময় মানুষ ওর আশ্চর্য লোকাতীত রূপ দেখত। এখন ওর অদ্ভুত ও ভীষণ কুশ্রীতা দেখে। সৌন্দর্য আর কুশ্রীতা, দুইই যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, দুয়েরই আকর্ষণই প্রবল হতে পারে। ও দেখেছে, তবু অস্ফুট আর্ত চিৎকারে জানাল, ক্ষতচিহ্নটা সত্যিই বড় ভয়ানক।

সান্যাল রায় বলতে শুরু করলেন, এই দাগটার জন্যেই তো নীল ভয় পায়। মা তুমি আগুনের কাছে যেও না। বোকা ছেলে। বোঝে না, আগুনে আমার নতুন করে ভয় পাবার কিছু নেই। আজ পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল। সেও এক শীতের সময়। রাত তখন অনেক। আমি আর নীলের বাবা পার্টি থেকে ফিরছিলাম।

শেষের দিকে ওঁর গলার স্বর যে রকম হয়ে গেল, তাতে সোনালি বুঝল, বহু কথিত এই গল্প সান্যাল রায় বারবার বলেন হয়তো শুধু নাটকীয়তা সৃষ্টি করবার আনন্দে। কিন্তু এই কাহিনীর অন্তর্লীন ট্র্যাজেডি ওঁকে এখনো স্পর্শ করে, ব্যথা দেয়।

সান্যাল রায় বললেন, সেদিনকার ঘটনার একটাই ভাল দিক দেখতে পাই। নীলকে নিয়ে আয়া ছিল অন্দর মহলে। আমাদের দুই এর সঙ্গে ও দিকের কোনো যোগ নেই। তখন বাড়ির সেটআপটা একটু অন্য রকম ছিল।

চোখ তুলে চাইলেন উনি। শান্ত বিষণ্ণ গলায় বললেন, এ ঘরটা ছিল পুরুষ মানুষদের বসার ঘর। এ বাড়িতে পুরুষদের ঘরে বাড়ির মেয়েরা কোনোদিন ঢোকেনি। নীলের বাবা ছিলেন অন্য রকম। এই ঘরে ওঁর বন্ধুদের সঙ্গে সেদিন আমাকে আলাপ করিয়ে দেন, সেদিন আমি নীল শিফন পরেছিলাম। গায়ের সঙ্গে চামড়ার মত থাকত। আমার ফিগার খুব ভালো ছিল।

সোনালি বলল, এখনো বোঝা যায়।

—বোঝা যায়, তাই না? বোঝা যায়?

যেন একটি কথায় ওঁর মনের কাছে চলে এল সোনালি। উনি নিচু হলেন, সোনালির চুলে আঙুল ছোঁয়ালেন। নরম গলায় বললেন, তোমারও খুব ভালো ফিগার সোনালি, খুব ভাল। তারপর বললেন, নীল শিফন পরেছিলাম। দিদিশাশুড়ীর দেয়া নীলার সেট। চুল বেঁধে দিয়েছিল মাদাম নাতালী। ওর বিউটি পার্লার ছিল। আমি

তো কিছুই জানতাম না। কি করে চুল বাঁধতে হয়, কি করে মেকাপ করতে হয়, সব নীলের বাবা মাদামকে রেখে শেখান।

যেন নীল ওঁর শত্রু, এই ভাবে আঙুল দেখিয়ে চুড়ি ঝলকানো ধারাল গলায় বললেন, এদিন বাড়িতে বংশ আর বংশের দস্তুরটা ছিল।

বাবা অতবড় সরকারী চাকরি করতেন, তখনকার আই. সি. এস। বাড়িতে বাবুর্চি-খানসামা-বেয়ারা-চাপরাশি — সব যেন হুজুরে হাজির।

কিন্তু দিদিশাশুড়ীর মুখে এক কথা। রূপ দেখে ভুলে গেলি ভাই? ঠাকুর্দা যা, চাকরও তাই। দেশে কি রাজার ঘরের মেয়ে নেই?

শান্তা বললেন, নীলের বাবার ছিল জেদ। তিনি বললেন, আমি বিয়েই করব না তবে।

শান্তার মনে পড়ল সব। নীলের বাবা বলেছিলেন, বিয়ে করতে হলে ওই মেয়েকে বিয়ে করব।

দিদিশাশুড়ী বলেছিলেন, কিছুতে নয়।

তাহলে বিয়েই করব না।

কেন?

তুমি কি ভাবছ? আমি রূপ দেখে ভুলেছি?

নইলে গুণ দেখে?

না দিদিমা। আমি ওকে ভালবেসেছি।

ভালবেসেছিস?

হ্যাঁ।

ওই একবার দেখে?

হ্যাঁ।

তাহলে ওকে বিয়ে করিস নে ভাই।

কেন?

এ বংশে ভালবাসা সয় না।

কেন

তাই তো দেখে আসছি চিরকাল। আমি তোর দাদামশায়ের

ভালবাসা পাইনি। ঘরের বউ, সে যত সুন্দরী হোক, তাকে ভালবাসতে এ বংশের পুরুষরা লজ্জা পেত।

আমার মা?

তোর মা তো আমারই মেয়ে। জামাই কোনদিন তার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেন নি।

আমি সে নিয়ম পালটে দেব।

ওবে বলিস নি। আমার যিনি দাদাশ্বশুর, তাঁর নাম ছিল অগ্নীশ্বব। তিনি না কি তাঁব বউকে ভীষণ ভালবাসতেন। ছেলে বউয়ের হাতে বশ হল দেখে তাঁর মা, সেই অগ্নীশ্বরের বউকে কলঙ্ক দিয়ে বের করে দেন।

ভদ্রলোকটি কি করলেন?

বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করেন। আগে বউকে মাবেন অবশ্য। কেন না, বউকে ভালবাসা যায়। কিন্তু বাড়িব বউয়েব নামে কলঙ্ক? মিছে কলঙ্ক হলেও সে বউকে বাচিয়ে বাখা চলে না।

তাঁর কথা আমাকে বলছ কেন?

ওই জন্তেই তো। এ বাড়িতে বউকে ভালবাসলে সবনাশ হয়। তুই ওকে ভালবেসেছিস? তাহলে অন্য মেয়েকে বিয়ে কব। নইলে সর্বনাশ হবে।

--মা, কি ভাবছ?—নীল বলল।

—দিদশাশুড়ীব কথা।

—ও!

--সোনালি, আমাদের যে বিয়ে হল, সে শুধু নীলের বাবার জেদে।

—তাই বুঝি?

- নীলেব বাবার খুব জেদ চেপেছিল সোনালি! উনি আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিজের মত করে নিলেন। ছেলেমেয়ে হয়নি বলে দিদিশাশুড়ী খুব কথা শোনাতেন। বিয়ে হয়েছিল সতেরো-আঠারো বছরে, আর নীল হল পাঁচিশ বছরে। সাত-আট বছর স্বামীর ভালবাসা

একা-একা পেয়েছিলাম। কপালে থাকল না। তাই ভাবি, ভালবাসা না পেলে হয়তো ও বেঁচে থাকতো।···সেদিনও এমনি শীত ছিল পার্টি থেকে ফিরেছি আমরা। ল্যাচ্-কি দিয়ে দোর খুলেছি। চাকররা যে যার ঘরে শুতে চলে গেছে। নীলের বাবা বলল, কালো কফি খাবে। শক্ লাগবে বলে আমি ইলেকট্রিকে ভারি ভয় পাই চিরকাল। কিচেনে গেলাম, দেশলাই জ্বেলে সুইচ জ্বাললাম। দাঁড়াও···সেদিন পরেছিলাম আগুনরঙা মাইসোর সিল্ক। আর হীরে।

—খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল নিশ্চয়।

স্নাহা রায় বিষণ্ণ হাসলেন। বললেন, খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল সোনালি। নিজের কথা নিজেই বলছি। অত সুন্দর কোন মানুষের হওয়া উচিত নয়। আমার মা বলতেন, ভদ্রঘরের মেয়েদের অত রূপ থাকতে নেই।

—তিনি নিজেও খুব সুন্দর ছিলেন?

না সোনালি। আমার রূপ ছিল সৃষ্টিছাড়া। অত রূপের জন্যেই তো সময়ে বিয়ে হয়নি। আঠারো হয়ে গিয়েছিল বয়স।

—অত রূপের জন্যে বিয়ে হয়নি!

—সবাই ভয় পেত। বলত, এত রূপ দেখার জিনিস। এত রূপ নিয়ে ঘরে তোলা যায় না, সুবিচার হয় না তাতে। যাক! বেশ মনে আছে···আমি কিচেনে গেলাম, কফি করলাম, আলো নেভালাম।

—তখন অনেক রাত?

—অ নে-ক রাত। খুব শীত। কিচেনের জানলা বন্ধ। আমার মনে হল, গ্যাসের চাবি বন্ধ করিনি। আমাদের বাড়িতে চিরকাল পাইপে গ্যাস আসে। এখনকার মত সিলিণ্ডার তখন ছিল না। আমি বললাম, কিচেনে গ্যাস লিক করছে। নীলের বাবা বলল, চাবি বন্ধ করেছ। দুজনে খুব খানিকটা তর্ক করলাম তাই নিয়ে। তারপর আমি আবার দেশলাই নিয়ে গেলাম। গ্যাস লিক করছে মনে হচ্ছে

বলে দেখতে যাচ্ছি, অথচ দেশলাই জ্বাললে কি হতে পারে সেটা ভেবে দেখিনি। আমার সেদিন ও রকম সর্বনাশা ভুল না হলে নীল পিতৃহারা হয না, আমার মুখ এ রকম হয়ে যায না। নীল। খুব ভুল করেছিলাম। ভাব প্রায শচন্ত আমিও ভবছি। এ রকম মুখ নিয়ে বেঁচে থাকা আটাশ বছর বয়স থেকে

নীল আস্তে বলল, তুমিই তো কবছ মা। আমার কোন সেনস অফ লস তো নেই? বাবাকে যদি পেতাম, তবে সে সেনস হত। বাবাকে তো আমি জানি না

স্বাহা রায বললেন তোমার বাবাকে জানতে পারলে না সে যে কত বড় ক্ষতি, তা তুমি জান না নীল। আমি তো তাকে জানতাম। সে যে লাইফ অফ পার্টি ছিল। জান সোনালি, আমি তো ওকে মরার পর দেখিনি? আমার দাদা বলেছিল, জানিস স্বাহা, মৃত্যুতেও দীনেশকে আমাদের চেয়ে বেশি জীবন্ত মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যে কোন সময়ে ও উঠে বসবে। বলবে, হোয়াট ননসেন্স! তোমরা আমাকে এখানে এনেছ কেন?

কান্নায় অনভ্যস্ত চোখ জলে চিক চিক করল। স্বাহা আস্তে বললেন, কত যে কথা বলত। ও আর আমি নাকি চিরকাল বেঁচে থাকব, আর এমনি ইয়ংই থাকব। বলত, আই মাস্ট স্টে ইয়ং। নইলে নীল বড় হয়ে বলবে, এ কি আমার বাবা এমন বুড়ো কেন? আমাকে ইয় থাকতেই হবে। ছেলের সঙ্গে ঘোড়ায চড়ব, শিকার করব, গাড়ি চালাব না?

নীল নিশ্বাস ফেলল। তারপর ওর নিশ্বাসে পরিবেশ বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে বুঝে বলল, ও রকম হি-ম্যান আমি তো হতাম না। বাবা চলে গিযে হয়তো ভালই হয়েছে।

স্বাহা আজ আশ্চর্য সহিষ্ণু উদারতা দেখালেন। বললেন, কে জানে নীল। ছেলেদের দরকার হয় বাবাকে, মাকে নয়। ও থাকলে তুমি কি রকম হতে তুমি কি জান?

—তুমি কি বলছিলে, বল না ?

—বলছি। জান সোনালি ! নট দ্যাট নীল ক্যানট ডু থিংস। হি ক্যান, প্রিটি ওয়েল। কিন্তু ও জাস্ট্ করবে না। ওর বাবার কাজিনের কাছে হাজারিবাগ গেল। সেখানে না কি মজা করে শুটিং প্র্যাকটিস করতে গিয়ে নীল বারবার বুল্স্-আই বিঁধেছিল। স্কুলের উঁচু ক্লাস থেকে পাহাড়ে চড়ার শখ হয়। পরপর কয়েক বছর মাউন্টেনীআস ক্লাবে গেল। এ্যামেচার এক্স্পিডিশ্যানে গিয়েই বেশ হাজার ফিট চড়ল। ডক্টর পালিত তো খুব প্রশংসা করতেন। কিন্তু আশ্চর্য ছেলে নীলের

—সে কথা থাক না মা ?

—ফর গডস সেক্, নীল, বলতে দাও। সেবার ওরা একটা ভার্জিন পীকে উঠবে। জান সোনালি, নীল সমস্ত এক্স্পিডিশ্যনটার স্কীম করল। ওদের সঙ্গে গেল। তেইশ হাজার ফিট পাহাড়। একুশ হাজার অবধি উঠে নীল বলল, তোরা ওঠ্। আমি যাব না। কিছুতেই গেল না ও। শুনে আমার এত দুঃখ হয়েছিল !

সোনালি নীলের দিকে মৃদু অনুযোগে চাইল। নীল হাসল। মাহা বললেন, সাঁতার বল, খেলাধূলো বল, সব তাতে রিপোর্ট এত ভাল, কিন্তু কোনদিন কোনও কম্পিটিশনে গেল না। স্কুল ফাদারদের কি কম দুঃখ ছিল তাতে ?

—হয়তো পারতাম না মা।

—না নীল আমাকে থামিয়ে দিও না। অন্য ছেলেদের বাড়িতে কত ট্রফি, কাপ, মেডেল থাকে। নীলের বাবা, ঠাকুর্দা, বাবার দাদামশায়ের শিকারের ট্রফি তো একটা গ্যালারি করে রেখেছি। নীল যে কোনদিন কিছু আনেনি বাড়িতে, তাতে আমার দুঃখ হয় না ?

—আমি যে হি-ম্যান নই, তাই তো প্রমাণ করে চলেছি মা। এখন তোমার যা বয়স য়ু লার্ন টু লিভ উইথ ইট।

—উইথ হোআট্ ?

—দ্যাট্ আই অ্যাম্ নট এ হি-ম্যান।

নীলের গলায় তিক্ততা। স্বাহার চোখে হিংস্র আনন্দ। পেরেছেন তিনি নীলকে বিদ্ধ করতে। নীলের প্রবল প্রতিরোধ ভেঙে গেছে। সোনালি দেখল, মায়ের ফাঁদে ধরা দিয়েছে বলে নীল যেন অনুতপ্ত। নীলের জন্যে ভীষণ কষ্ট হল ওর। কেন যে মা আর ছেলে পরস্পরকে ছোট করে কষ্ট পান ?

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইলেন। নীল মুখ ফেরাল। পাইপে তামাক ভরল, লাইটার ঠুকল, জ্বালাল।

স্বাহা বললেন, হ্যাঁ যা বলছিলাম···আমি দেশলাই জ্বেলেছি। সুইচ খুঁজে নিয়ে আলো জ্বালব। বাতাসে তখন গ্যাস। বাতাস জ্বলে উঠল। কি হয়েছে, তা বুঝতে পারার আগেই দেখলাম আমার শাড়ী, সেমিজ, সব দাউদাউ করে জ্বলছে। ও ছুটে এসে আমাকে টানতে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আর আমি কিছু জানি না সোনালি। কি করেছিল ও, নিজে কখন অজ্ঞান হয়ে যায়, লোকজন কখন আসে।

বেশ কিছুক্ষণ সকলে চুপ করে রইল।

সোনালি আস্তে বলল, উনিও কি পুড়ে গিয়েছিলেন ?

–না, হি ডায়েড অফ সাফোকেশ্যান। বাতাসে অক্সিজেন ছিল না। কার্বনিক মনোক্সাইড গ্যাস ইনহেল করে······নীল, তুমি তো জেনেছ, ও বেশি কষ্ট পায়নি ?

সোনালি খুবই অবাক। নীল কেমন করে জানবে ওর বাবা মৃত্যুকালে বেশি কষ্ট পাননি ? নীলের বয়স তো তখন মাত্র তিন।

নীল বুঝল সোনালি অবাক হয়েছে। ও সোনালির দিকে অপ্রতিভ হেসে বলল, আমার জানার ইচ্ছে হয় এক সময়ে খুব। তখন আমাদের ক্লাব থেকে এমেচার ফায়ারব্রিগেড-ট্রেনিং নিচ্ছিলাম। স্কুলেই পড়ি, ক্লাস ইলেভেনে। ডাক্তারদের কাছে বারবার জেনে নিতাম। বাবার মৃত্যুর কথা তাঁদের কাছে বলতে তাঁরা বলেছিলেন বাবা যে-ভাবে মারা যান, সে মৃত্যু খুব সময় নেয় না।

নীলের চোখ কুঁচকে গেল। অন্যমনস্ক নীল, প্রায়-বিষণ্ণ, অবসন্ন, পরাজিত যেন—নীল আস্তে বলল, প্রায় স্বগতোক্তিতে, পি. জি.-র ডাক্তারদের কাছেও কি যাইনি? কত করে সেই পুরনো রেকর্ড ঘেঁটে বের করেছিলাম, বাবার কেস ফাইল। না, বাবা খব একটা কষ্ট পাননি।

—কষ্ট পাননি নীল!

—মা, আমি তোমায় আগেও বলেছি তো? কষ্ট নিশ্চয় হয়েছে। প্রবল কষ্ট। অক্সিজেনের বদলে লাংসে কার্বনিক মনোক্সাইড গ্যাস ঢুকতে থাকলে অমানুষিক কষ্টই হবার কথা। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে যান। কষ্ট যখন হচ্ছে, তখন তো ব্রেনও আর নিতে পারছে না। কাজেই যে-সব সেন্স অর্গ্যানে কষ্টের ফিলিং টের পাওয়া যায়, সেগুলোও কাজ করে না। কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু কষ্টের তীব্রতা বোঝেননি। মৃত্যুও তাড়াতাড়িই হয়।

স্বাহা বললেন, জানি নীল, কতবার শুনেছি। তবু—

সোনালি দেখল স্বাহা রায়ের চোখে আহত বেদনা, ক্ষুণ্ণ অভিমান ভাগ্যের উপর। বুঝল সহসা বিদ্যুৎ-উদভাসনে ওই কঠিন, হিংস্র, বিকৃত, জটিল মহিলার ভেতরের হতভাগ্য স্বাহা রায়কে দেখতে পেল ও। স্বাহা রায়ের জীবনে সব চেয়ে বড় ট্রাজিডী ঘটে গেছে সেই এক শীতের রাতে, বিগত অতীতে। জীবনের একমাত্র ভালবাসা থেকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত হয়ে ওঁর জীবন সেখানেই বন্দী হয়ে থেকে গেছে। আজও উনি সে কথা ভোলেননি। সেই মৃত ও অতীত অধ্যায় আজও এত বাস্তব ওঁর কাছে, যে তার কাছে বহু প্রয়োজনীয়, জরুরী সত্য অবাস্তব হয়ে রয়েছে।

যেমন ওঁর একমাত্র সন্তানের সুখ।

ওঁর দিকে চেয়েই সোনালি বুঝল, নীল কত গৌণ ওঁর কাছে। আজ, সমস্ত রূপ-যৌবন যখন অতীতের স্মৃতি, তখনো উনি নিজেকে প্রথমে মা, তারপর কারো স্ত্রী বলে ভাবতে পারেন না। সেই

একদার স্মৃতিতেই স্বেচ্ছা-বন্দী হয়ে থাকেন সর্বদা। তাই নীলের উপর অবিচার করে চলেন নিরন্তর।

কিন্তু তবু সোনালির শ্রদ্ধা হল। প্রেমকে এতখানি মর্যাদা দিলে তাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় কি? সোনালি মুগ্ধ হল।

ওর দিকে সস্নেহে চাইলেন স্বাহা রায়। উনি কি বুঝেছেন, মৃত স্বামীর প্রতি সপ্রেম আনুগত্য আছে বলে সোনালি ওঁকে ভাল না বেসে থাকতে পারছে না--যে সোনালি নীলকে বিয়ে করবে, আর নীলকে উনি ভালবাসেন না, যদিও নীল ওঁর আত্মজ?

স্বাহা রায় বললেন, কফি খাওয়া যাক সোনালি! তারপর তোমাকে ছবির গ্যালারি দেখাব। ফ্যামিলির সকলের ছবি তো তুমি দেখনি।

—তুমি দেখাবে মা?

না, নীল, আমি তো দোতলার ওদিকে যাই না। তুমি ওকে নিয়ে যেও। ও সব দেখে টেখে নিক। পরে তো ওই দেখবে।

স্বাহা রায় বোতাম টিপলেন। ট্রে ট্রলি ঠেলে ঢুকল বিসরা। রূপোর কফি পট, চিনি ক্রীম পট। কয়েক রকম বাদাম, স্যাণ্ডুইচ, পেস্ট্রি, কেক, ক্রীম ও মাখনের রোল, মাছের ফিঙ্গার রোল, সাদা মচমচে আলু ভাজা। এত খাবার সোনালি একসঙ্গে দেখেনি জীবনে চোখের সামনে।

—বিসরা, দেখ, খোকার বউ হবে।

বিসরা অন্ধকার ও বোবা, ভাষাহীন চোখে সোনালিকে দেখল। মাথা নাড়ল।

—সোনালি, কফি ঢালো।

স্বাহা হেলান দিয়ে বসলেন চেয়ারে। হাত নামিয়ে কাঠের কুচি নিলেন, ফায়ারপ্লেসে ছুঁড়লেন। স্বপ্নিল গলায় বললেন, আগুন আমার খুব ভালো লাগে।

সন্ধ্যে হবার আগেই মিণ্টো পার্কের বাড়িতে আলো জ্বলছিল। শীতের সন্ধ্যে খুব তাড়াতাড়ি আসে। সমস্ত বাড়িতে আলো জ্বলল, নিচে কাচের বাসনের টুং টাং শব্দ। নীল দরজায় টোকা মেরে গেল, 'সোনালি, গেট্ রেডি। এখনি মামা-মামীমা এসে পড়বেন।'

—'হয়ে যাবে এখনি।'

সোনালি দেয়াল ঢাকা কাচের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল নিজেকে। মাথা নাড়ল বিস্ময়ে। নিজেকে চেনা যায় না আর। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে হয়েছে, সে তো এগারো মাস হতে চলল। কিন্তু মনে হয় গা থেকে বিয়ের গন্ধ ছাড়েনি এখনো।

এখনো সোনালি স্বপ্নে ডুবে আছে। স্বপ্ন ছাড়া কি? সোনালিকে এনে রাখা হয়েছিল এ বাড়ির ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। বিয়ে হল আলিপুরে এক প্রাসাদ ভাড়া করে। গাড়ির প্রসেশ্যন নিয়ে বর এসেছিল। বউভাত উপলক্ষে এ বাড়িতে সাতদিন ধরে রিসেপশ্যন চলে। উপহারের হিসেব রাখার জন্যে ছজন কর্মী মহিলাকে নিয়ে লতিকাদি মোতায়েন থাকেন। সোনালির গয়না, উপহারের গয়না ও টাকা রাখার জন্যে একটি স্টিল আলমিরা রাখা হয়। বড় আলমারিতেও ধরতে চায়নি সব।

সাতদিন সাত রকম গয়নার সেটে সোনালিকে সাজান স্বাহা

রায়। শেষদিন সোনালি হীরে পরেছিল। হীরের একলহরী, চুড়ি, ঝুমকো, আংটি। সাদা বেনারসীতে সোনার তারে সম্পূর্ণ রামায়ণ কথা নকশা-করা।

শাড়িটি ওর হাতে দিয়ে স্বাহা রায় বলেছিলেন, আর কোনো আড়াল রাখলাম না সোনালি, নিজের বলে কিছু। এই শাড়িটা আমার জন্যে তৈরি করিয়েছিল নীলের বাবা। ও চলে যাবার পর তবে শাড়িটা এল বেনারস থেকে। বেনারসের ভকতলাল চিরকাল এ বাড়ির শাড়ি তৈরি করত। এ তার তৈরি শাড়ি। এ শাড়ি আমি একবারও পরিনি।

—আমাকে দিচ্ছেন কেন?

—আর কাকে দেব?

—এই শাড়িটা পরব?

পর না? দাঁড়াও একটু! শাড়িটার নকশা দেখেছ? মিনাকারি কাজে জোড়া ময়ূর?

হ্যাঁ দেখছি তো।

—একটু দাঁড়াও!

স্বাহা ঘর থেকে এনেছিলন একটা মখমলের বাক্স। সেটা খুলে সোনালি অবাক হয়ে গিয়েছিল। বেনারসীর গায়ে যেমনটি, ঠিক তেমনি মিনাকারি ময়ূরের কানবালা, নেকলেস, আংটি, ব্রেসলেট!

—এগুলো আমি পরব?

—তোমাকেই তো দিলাম।

—না না, এমন করে সব দিয়ে দেবেন না।

সোনালি যেন ভয় পেয়েছিল। এমন করে সব দেবেন কেন নীলের মা? কেন এত ভালবাসবেন ওকে? হায়, ভালবাসা নেবার দায়দায়িত্ব যে অনেক, আর সোনালি যে বড়ই অনভিজ্ঞ। কেমন করে এত দায় ও বইবে?

স্বাহা রায় ওর দিকে করুণ মমতায় চেয়ে থেকেছিলেন? সব দিয়ে

দিচ্ছেন তিনি? সব কাকে বলে? স্বাহার স—ব কি? নীল? না না, নীল ওঁর সব নয়। নীল কিছুই নয় ওঁর। কিছুই দেননি উনি সোনালিকে।

—তুমি আমার মেয়ে সোনালি! বলতে বলতে অনলের কাছে মাপ চেয়েছিলেন মনে মনে। সোনালি কেমন করে তাঁর মেয়ে হবে? তাঁর আর অনলের স্বপ্নে তো ছিল তাঁরই প্রতিরূপা একটি অলোকসামান্যা মেয়ে। আগুনের মত রং, সুন্নত গলা, সুডোল বুক, লালচে সোনালি চুল, চাহনিতে তীব্র সুরা, আঙুলের স্পর্শে বিদ্যুৎ।

সেই স্বপ্নসম্ভবা, সেই নীলাঞ্জনা তো এল না তাঁর কোলে। এল নীল! সোনালি, তুমি আমার মেয়ে নও।

—সোনালি তুমিই আমার মেয়ে। স্বাহা আবার বলেছিলেন।

আর সোনালি জড়িয়ে ধরেছিল ওঁকে। বলেছিল হ্যাঁ, আমি আপনার মেয়েই হব। সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেব আপনার।

সাতদিনের উৎসবে নীলের ভূমিকা ছিল খুব গৌণ। স্বাহা ছিলেন আর সোনালি ছিল।

তারপর আটদিনের দিন স্বাহা রায় বলেছিলেন, নীল ভাবছে, মা যা দিচ্ছেন স—ব সোনালিকে।

ওকেই তো দেবে, মা!

তোমাকেও দেব।

কি?

কি দিচ্ছি তা তুমি ভাবতেও পার না।

কি, মা?

বিয়ে করেছ, হনিমুনে যাবে না?

ভাবছিলাম·····

কি?

দীঘা যাব।

দীঘা!

দীঘা খারাপ জায়গা নয়।

দীঘা।

তুমি কি শক্‌ড হলে?

স্যাহা রায় মস্ত একটি নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, খুব করুণ মিনতিতে বললেন, কেরানী-টেরানী দীঘায় যায় নীল। আর যায় যাদের কোন ক্লাস নেই, তারা। তুমি দীঘায় যেও না। কুলু-মানালি যাও, সিমলা যাও, দীঘা যেও না। তুমি দীঘা গেলে আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারব না।

মুখই দেখাতে পারবে না?

না নীল, না। সমাজে কত কথা হবে তা জান? তুমি তো যাও না কোথাও, আমি যাই। সবাই বলবে এই বিয়ে করেছে বলে স্যাহা রায় ছেলেকে ত্যাগ করেছে।

বল কি, মা? বিয়ের পর দীঘা গেলে এই সব কথা উঠবে? না না, তার চেয়ে আমি য়ুরোপ যাচ্ছি। যাব মা? য়ুরোপ?

নীল, হয় দীঘা নয় য়ুরোপ?

তাও বাড়াবাড়ি হয়ে গেল? তাহলে বরং আমরা ছাতে যাই। কি বল সোনালি, ছাতে যাবে?

ছাতে!

আরে সে এক গল্প, বুঝলে মা! তোমার উইমেন্‌স হোমের ক্লার্ক হরিদা জন্মে কোথাও যাননি।

তাকে তুমি "হরিদা" বল?

আরে হরিদা আমার অনেক দিনের দাদা।

নীল, নীল!

এগুলো জনগণসংযোগের কাজ মা!

কি বলছিলে, তাই বল।

হরিদার বউ ধরেছেন এবার পূজোয় কোথাও যাবেন। হরিদা

নড়বেন না, বউদি যাবেন, বাড়িতে তুমুল কোন্দল ওআর চলল। শেষে আমি যাই ঝগড়া মেটাতে।

তুমি--ওর—বাড়ি—গেলে?

কত গেছি। সেই বাদামী সোয়েটারটা তো বউদি বুনে দিল। যাক্ গে, আমি যখন বললাম, কাশী যান হরিদা—হরিদা বলল, কাশীতে বাঁদরের উৎপাত। পুরীতে পাণ্ডার উৎপাত, দিল্লীতে বেজায় ভিড়, মাদ্রাজে সবাই ইংরিজি বলে -হরিদার আর জায়গা পছন্দ হয় না। শেষে রেগে বউদি বলল, তুমি ছাতে যাও, বুঝলে? তাই বলছি, হনিমুনে ছাতে গেলেই হয়। সাত-দশ দিনের জন্যে?

স্নাহা রায় বললেন, তা হবে না নীল। কোন ভাল জায়গায় যাও।

তুমি তো জায়গা বেছে রেখেছ।

কি করে জানলে?

তোমাকে জানি যে।

তোমরা কুলু-মানালি যাবে। সব ঠিক করে রেখেছি। পাঠানকোটে যাবার আসার টিকিট, ট্যাক্সি, বলর হোটেল, মানালিতে ব্যারনের বাংলো।

ক দিনের জন্যে?

দশ দিনের বেশি ভাল লাগবে না।

আর কে কে যাচ্ছে?

স্নাহা রায়ের মুখের অক্ষত দিকটা ছোট মেয়ের মত দোষী দোষী হয়ে গেল। তিনি বললেন, মেহতারা যাচ্ছে। ওরা তোমাদের বেশ কম্প্যানি হবে।

কি করে?

কেন?

ওরা ইংরিজি ছাড়া কথা কয় না। সোনালিকে বোবা হয়েই থাকতে হবে। মেহতা সঙ্গে হলেই বউয়ের সঙ্গে বোতল খোলে। আমি ও রসে বঞ্চিত। ওরা রাত-দিন রেকর্ডে জ্যাজ বাজাবে আর নাচবে।

নীল ! তুমি তো সমাজে যাও না। মেহ্তা আর ক্যাথলীন কি রকম পপুলার তা জান ?

বেশ !

নীল আর সোনালি পাঠানকোট গিয়েছিল। ওরা যাতে নিরিবিলিতে যেতে পারে সে জন্যে চারটে টিকিট কিনে একটা এয়ার-কনডিশনড ফার্স্ট ক্লাস কামরা জোগাড় করা হয়েছিল।

পথে মেহ্তারা ছুটে ছুটে এসে ভদ্রতা করেছিল খুব। নীলও খুব মিষ্টি কথায় ওদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল বার বার। তারপর, পাঠানকোটে পৌঁছে নীল যা করেছিল, তা ভাবলে এখনো সোনালি তাজ্জব হয়ে যায়।

ট্যাক্সিতে উঠে নীল ড্রাইভারকে কি বলেছিল। সোনালির কাছে সবই এত নতুন ও অচেনা, যে ও মোটে বোঝেনি কোথায় যাচ্ছে।

ও শুধু অবাক হয়ে দেখছিল আর নীলের হাত ধরে টানছিল।

ও মা ! দেখ, সত্যি পাহাড় !

ও মা ! দেখ গাছগুলো ? ঠিক সিনেমার গাছের মত দেখতে, তাই নয় গো ?

দেখেছ, মেয়েটা কি রকম পোশাক পরে ছাগল চরাচ্ছে ?

ঠিক যেন সিনেমা দেখছি।

তারপর একটা জায়গায় পৌঁছয় ওরা। যে হোটেলে পৌঁছয়, সে রকম সুন্দর জায়গা সোনালি সিনেমাতেও দেখেনি। তারপর ঘরের সঙ্গে বসার ঘর, বাথরুম, কাঠের পালিশ করা মেঝে, জানলা দিয়ে বাইরে দীর্ঘ ওকগাছ, বরফঢাকা পাহাড়—কোন্ বিষয়টা কম ?

ঠাণ্ডা, ভীষণ ঠাণ্ডা। ঘরে কাঠের আগুন জ্বেলে দিয়ে গেল বেয়ারা। আগুনের সামনে বসে মুরগির মাংস আর পরোটা খাওয়া। রাতে শোবার আগে কিছুই বোঝেনি সোনালি। শোবার সময়ে সোনালি বলল, মেহ্তারা গেলেন কোথায় ?

স্নো-ভিউ হোটেলে।

সে কি! আমাদের এ হোটেলের নাম তো অন্য।

হবেই তো। স্নো-ভিউ তো কুলুতে।

আহা! এ হোটেলটা কোথায়?

কেন. ডালহৌসীতে?

সে আবার কি?

শীগগির আরেকটা কম্বল দাও পায়ে, উ হু হু—বেজায় শীত। মার কথা শুনে কুলু গেলেই হত

কি বলছ তুমি?

ভীষণ চটবেন মা।

কেন? তুমি কি করেছ?

নিজের বউকে চুরি করেছি।

কি বলছ বল না?

আগে বল কিছু বলবে না?

বলব আবার কি?

তুমি এদিকে তাকাবে না। কি মাখছ, মাখো। কি মাখছ বল তো? আমার চুলে লাগাবার ব্রিলিআন্টাইন? মাখো, মাখো। মুখ ভর্তি বড় বড় চুল গজাবে।

সে কি?

সোনালি মুখ ঘষতে ঘষতে লাল করে ফেলল। কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, মা স—ব ঠিক মত মাখতে বলেছেন। কিন্তু আমি যে এত সব চিনতেই পারি না।

কিচ্ছু মেখো না। সরষের তেল ছাড়া কিচ্ছু মাখোনি বলেই তো তোমার চামড়া এত সুন্দর।

কি বলছিলে?

মার কাছে বকুনি কি তুমিই খাবে একা?

কেন, তুমি কি করেছ?

আরে, আমার জন্যে তো ওঁর ভাবতে বয়ে গেছে। ওঁর পেয়ারের

বউ পুতুলটি খোয়া গেল ভেবে উনি কাল থেকে টেলেক্স পাঠাতে থাকবেন, পুলিসে খবর দেবেন।

কে---ন?

এটা কুলু নয় সোনালি। এ জায়গাটার নাম ডালহৌসী। মেহতাদের হাত এড়াবার জন্যে এই দুষ্কর্মটি করলাম। মা খেপে যাবেন।

“অ্যা?

এটা ডা---ল---হৌ---সী!

আমরা অন্য জায়গায় এসেছি?

নিশ্চয়।

সোনালি আর নীল তখন হেসে হেসে পেটব্যথা করে ফেলেছিল। মেহতা আর ক্যাথলীন যখন দেখবে নীল আর সোনালি আসে নি, তখন? খুঁজতে খুঁজতে ওদের কি হাল হবে? স্বাহা রায়কে ওরা কি জানাবে?

ডালহৌসী, ডালহৌসী! স্বপ্নের দেশ ডালহৌসী। চারদিক নিশ্চুপ, চারদিকে পাহাড়, চারদিকে বুনো গোলাপ ফুল। সকালে দেরি করে ওঠ, বেড-টি খাও। গরম জলে স্নান কর, বেরিয়ে পড়।

পাহাড়ের পথ ধরে হেঁটে চলতে চলতে হঠাৎ পেয়ে গেলে তারার মত ডেইজি ফুলের গালচে ঢাকা পাহাড়। সেখানেই বসে পড়।

কখনো ক্রীম-ফেসিয়াল-বেস মেখো না। চুলের ঢাল খুলে রাখতে পার, ঢোলা কার্ডিগান গলিয়ে যেখানে ইচ্ছে চলে যাও।

নীল বলল, কিচ্ছু জানাব না মাকে।

সোনালির জেদে ওরা একটা টেলিগ্রাম স্বাহা রায়কে পাঠায়। তারপর চলে যায় কালাটোপ। কালাটোপ, খাজ্জিয়ার, চম্বা। আ---বীয়াস নদীর কল্লোল শুনতে শুনতে সন্ধ্যায় চম্বার পথে বসে টাটকা মাছভাজা খাও গরম-গরম। তারপর টুরিস্ট লজে ফেরার সময়ে একটা দোকানে ঢুকে পড়ে মস্তি সিংয়ের মুখে কাওয়ালী গান শোনো।

দশদিন—বারো-পনেরো—একমাস বাদে ওরা ফিরেছিল। চম্বা থেকে কেনা ভেড়ার লোমের টুপি পরে নীল যখন নেমে, মা! বলে ডাকল—তখন ছুটে বেরিয়ে এসে স্বাহা রায় ভঁ্যা করে কেঁদে ফেলেছিলেন।

নীল তখনি মাথার টুপিটা বিসরার মাথায় পরিয়ে দেয়। তারপর বলল, জেল দেবে না, ফাঁসি—তা পরে ভেব মা। আগে কিছু খেতে দাও। সব পয়সা খতম। থার্ডক্লাস স্লিপারে ফিরেছি। একটা থালি দুজনে ভাগ করে খেয়েছি। তাও সোনালি সব খেয়ে ফেলেছে।



আজ, ১৯৬১-র ডিসেম্বরে সাজতে সাজতে সব মনে পড়ল সোনালির। এগারো মাস বিয়ে হয়েছে, আর তিনশো তিরিশ দিনে বোধ হয় সাড়ে তিনশো শাড়ি পরেছে সোনালি। সকাল থেকে রাত অবধি স্বাহা ওকে নিজের তত্ত্বাবধানে চালান। ওর আর নীলের স্যুইট সাজিয়ে দিয়েছেন স্বাহা।

মানুষ যে পালঙ্কের বিছানায় শোয়, তা সোনালি জানত না। আরো কত কি জানত না! ঘুম ভাঙে ঘড়ির ভেতরের পাখিদের ডাকে। উঠে মুখ ধুতে না ধুতে কমলালেবুর রস খেতে হয়। স্নান করতে হয় বাদাম-বাটা, দুধের সর, অলিভ অয়েল মেখে।

স্নানের পর হেয়ার ড্রায়ারে চুল শুকিয়ে বেঁধে দেয় আয়া। তারপর

সাজতে হয়। সকালে সুতির শাড়ি, দুপুরে জর্জেট, রাতে সিল্ক। ম্যাচি গয়না। তিন প্রহরে তিন রকম পারফিউম।

ওর আর নীলের ব্রেকফাস্ট আসে এ মহলে। ডিম-পরিজ-সসেজ-সিদ্ধ চিকেন-ফল-মধু-মাখন-ক্রীম-চীজ-কর্নফ্লেক। ওরা কতটুকুই বা খায় আর। এত খাবার কি হয় রোজ সোনালি ভেবে পায় না। কিন্তু কিছুতে ওদের সঙ্গে এক টেবিলে ব্রেকফাস্ট খান না স্বাহা। নীলের ব্যাপারটাও বোঝে না সোনালি। মাকে ওদের সঙ্গে খেতে বলার কথা বললেই নীল বিরক্ত হয়। বলে, তোমাকে রাতদিন দখল করে রেখেছেন। সকালটুকু আমাকে দিতে পার না?

নীল বেরিয়ে যায় ন'টায়। দুপুরে বাড়িতে খায় না। বিকেলে ফেরে।

ওর জামাকাপড় গুছিয়ে দেয় সোনালির সে সাধটুকুও মেটে না।

স্বাহা বলেন, ও লোকজনের কাজ।

নীল হাসে। বলে, করতে দাও, যা চান। এত বছর তো দেখেননি ছেলে কি পরে, কি খায়!

—আবার ওই কথা?

খুব দুঃখ হয় সোনালির। কেন নীল মায়ের প্রতিটি আচরণকে এমন করে ব্যাখ্যা করে?

—মা কি তোমায় ভালবাসেন না?

নীল বলে, আমি কিচ্ছু বলব না।

আজ নীলের কথা ভাবতে ভাবতে সোনালি রূপোর তারা ছেটানো মাঘের সন্ধ্যার মত ধূসর সিল্ক পরল। রূপোর গয়না। স্বাহার সেই নির্দেশই ছিল।

নিচে নেমে এল সোনালি। থমকে দাঁড়াল।

স্বাহার প্রতিরূপা জীবনপ্রতিম পুতুলগুলো আজ যেন বিয়ের কনে সেজে দাঁড়িয়ে আছে। এ বাড়ির অনেক কিছুই বোঝে না সোনালি, সব চেয়ে কম বোঝে এই পুতুলগুলোর ওপর স্বাহার অন্ধ আসক্তিকে।

রোজ মনে হয়, আজ বেশি করে মনে হচ্ছে ওগুলো যৌবনের স্বাহা রায়। কিন্তু সে জন্যে সোনালি থমকে দাঁড়ায়নি। স্বাহা একটির পর একটি পুতুলের গালে টোকা দিচ্ছেন আর বলছেন, নীল! নীল! নীল!

যেন মন্ত্রে জানলেন পিছনে সোনালির উপস্থিতি। ছিটকে সরে এলেন স্বাহা। এলাচ খেলেন এক মুঠো। টলে পড়ে যাচ্ছিলেন প্রায়। চেয়ার ধরলেন মুঠোয় চেপে। সামলে নিলেন নিজেকে।

—মা!

সোনালি ছুটে নেমে এল, ওঁকে ধরতে গেল, কিন্তু পিছিয়ে এল। ওঁর মুখে একটা গন্ধ। গন্ধটা সোনালির চেনা। ওদের হোমের অনিলবাবুর মুখেও অমন গন্ধ পাওয়া যেত। নীল তাঁকে তাড়িয়ে দেয়।

কি হল, সোনালি? স্বাহার গলা অচেনা এবং হিংস্র।

সোনালি অজানা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। পিছিয়ে এল।

—সরে গেলে কেন সোনালি?

সোনালি যা বলবে না ভেবেছিল, তাই বলে ফেলল হঠাৎ।

—পুতুলদের 'নীল' বলছেন কেন?

সোনালি ভয় পেয়েছে। না, এ সব ঘটেনি কিছু। এ সব ঘটেনি। পুতুলদের আদর করে বুকে ও মুখে টোকা দিয়ে 'নীল নীল' বলেন নি। হিংস্র, আক্রোশী চোখে ওর দিকে চেয়ে নেই উনি। কেন চেয়ে থাকবেন? কেন?

উনি তো ভালবাসেন সোনালিকে। বলেন, ও ওঁর মেয়ে। সকলকেই তো বলেন, বউ চেয়েছিলাম, মেয়ে পেয়েছি। নীল আমার ছেলে, আর সোনালি আমার মেয়ে।

তাই তো জানে সোনালি। কিন্তু এ কি সেই একই স্বাহা রায়? সাদা দুধ গরদের শাড়ির নিচে থেকে ফুঁড়ে উঠেছে বুক। এই প্রথম সোনালির মনে হল, এই বয়সের এক মহিলার পক্ষে এ রকম জামা পরা অশোভন।

খোঁপা আলগা হয়ে ঝুলছে। আধখানা মুখে উগ্র প্রসাধন, আধখানা মুখ বিকৃত। একটি চোখ জ্বলছে অন্ধ রাগে।

ছুটে এলেন সাহা। বললেন, কি বললে তুমি? 'নীল' বলছি কেন?

—না, না, আমি·····

—পিছিয়ে যাচ্ছ কেন? শোন? শুনে যাও।

—না, আমি শুনব না।

—শুনতেই হবে। আমি আর অনল চেয়েছিলাম মেয়ে। তার নাম হবে নীলাঞ্জনা। ডাকব 'নীল' বলে—

—আমি শুনব না।

—মেয়ে হবে, ঠিক আমার মত রূপ হবে তার

আমি শুনব না।

—সে হয়নি। নীল হয়েছে। কিন্তু কি, আমার রূপ? রূপের কথা আমি ভুমি কি করে? সোনালি····

সাহার গলা কান্নায় ভেঙে এল। হাহাকার করে উনি বললেন, কাল ছিলাম বিউটি কুইন। আজ কুৎসিতের অধম কুৎসিত?

সোনালির মনে হল, এ সাহা রায়কে সে চেনে না।

—তোমার তো রূপ ছিল না সোনালি? তুমি কি করে জানবে, কি করে জানবে

অনেক চেষ্টায় সোনালি নিজেকে সংযত করলে। বলল, শান্ত হোন।

—শান্ত হব? কেমন করে?

—ওরা এখনি আসবেন। ও গেছে······

—তুমি, তুমি শুনবে না ওই পুতুলগুলোকে কেন····

—না শুনব না।

—যৌবনে আমি যেমন ছিলাম, আমার রূপ নিয়ে জন্মালে নীলাঞ্জনা যেমন হত, পুতুলগুলো সেই কথা মনে রেখে তৈরি

সোনালি সকরুণ মমতায় বলল, বুঝেছি।

——না, বোঝনি। চেঁচিয়ে উঠলেন মাতা। বললেন, তুমি ভেবেছ চালাকি করে পার পেয়ে যাবে? আমাকে দেখে ফেলেছ ভয়াল মূর্তি।

সোনালি কেঁদে ফেলল। বলল, কেন এ রকম করছেন মাতা? আমি কি কিছু বলেছি?

হঠাৎ হাসতে গেলেন মাতা। কিন্তু সেই অপমানের ও নির্দয় দেখাল ওঁকে। উনি বললেন, নীলকে বলবে এ সব কথা? তাই না?

মাথা নাড়ল সোনালি। খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। নীলের জন্যে। এখন ও বুঝেছে নীল কেন সইতে পারে না মাকে। কেন নীলের চোখ এত নিঃসঙ্গ, ক্লান্ত, ব্যথাতুর।

—কিছুই বলবে না তুমি নীলকে?

—না, বলব না।

কখনো ভুলবে না তুমি কে। মনে রাখবে, আমার জন্য তুমি এ বাড়িতে ঢুকতে পেরেছ।

—ভুলব না মাতা?

এ বাড়ির বউ হতে পেরে, সোনালি, নিজের সুখ শান্তি নষ্ট হয়। আমি দিয়েছিলাম, তাই তুমি এখানে আসতে পেরেছ নীল, নীল তোমাকে · তুমি নীলকে · কি ভেবেছ

সোনালি বুঝতে পারল এতক্ষণে। মাতা জানলেন না নিজের পরাজয়ের বীজ রোপণ করলেন এখনি। ও আর নীল সুখী হবে, ওদের সুখে মাতার ঈর্ষা। সোনালির মনের কোথায় সংকল্প জেগে উঠল। নীলকে ও বাঁচাবে। বাঁচাবে এই রাক্ষসীর হাত থেকে।

নীল মানে আশাভঙ্গ? নীল কেউ নয়? কিছু নয়? মাতার মত সর্বনাশ। আরেকটা মেয়ে জন্মায়নি বলে দয়া করে 'নীল' নামটা দেওয়া হয়েছিল এঁটো কাঁটার মত ছুঁড়ে।

সোনালির হঠাৎ মনে হল শুধু ও নয়, নীলও অনাথ, অসহায়।

স্নেহ পায়নি, পায়নি ভালবাসা, মমতা। নীল থাকত চাকরদের হেপাজতে গরমের ছুটিতে। কুকুরদের গরম সয় না বলে স্বাহা ওদের নিয়ে মানালি যেতেন। নিঃসহায় নীল! তাই বুকে এত ব্যথা, প্রেসারের কষ্ট, এই মায়ের ভার বয়ে-বয়ে। স্নেহের টানে নীলকে নিজের কাজেকর্মে আটকাননি স্বাহা। আটকেছেন, ওকে নিজের মত নিজের জীবন গড়ে নিতে দেবেন না বলে।

তাই এত অনুযোগ আর বিঁধে চলা!

নীল কেন আরেক অনল রায় নয়!

স্বাহা এখনও ওকে বাঘিনীর মত ক্ষুধার্ত চোখে দেখছেন। সোনালি ওঁকে নিরাশ করে কঠিন গলায় বলল, ঘরে যান! শান্ত হয়ে আসুন।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন স্বাহা।

-তুমি আমাকে হুকুম করছ?

-ঘরে যান।

সোনালি!

আপনারই দাদা বউদি আসছেন।

--এত সাহস! এত স্পর্ধা!

--ঘরে যান। সময় নেই।

—কোত্থেকে এই সাহস পেলি তুই? অরফানেজের এঁটো মেয়ে?

—আপনি তো তা জানেন।

হঠাৎ বুঝলেন সব স্বাহা। চেঁচিয়ে উঠলেন, তাহলে নীল তোকে ভালবাসে?

– আমি একটা কথাও বলব না।

– -ভা ল-বা-সে নীল!

স্বাহা হঠাৎ হেসে উঠলেন। বললেন, অনলের ছবি দেখেছ সোনালি? অনলের ছবি?

—দেখেছি।

সোনালির চোখ গিয়ে পড়ল দেওয়ালে। ফর্সা, দর্পী, উদ্ধত, উগ্র অনল রায়। সোনার গিল্টি ফ্রেম থেকে সাহংকারে চেয়ে আছেন নিচের দিকে। অনল রায়! নীলের বাবা। নীল যখন তিন বছরের, তখন উনি মারা যান। কিন্তু নীলকে দেখে তখনি নাকি ওঁর বুক ভেঙে গিয়েছিল।

অনল ভালবাসতে জানত।

সোনালি ওঁর দিকে চাইল। এখন ওকে শক্ত হতে হবে কেন না নীল খুব বিপন্ন। নীলের মা-বাবা—এই বাড়ি—এই বৈভব—এই সবকিছু খুব শক্তিশালী। সোনালিকে শক্ত হতে হবে, কারণ নীলকে ও ভালবাসে।

আপনি এখনি ঘরে যাবেন।

-না।

স্বাহা চেঁচালেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আদিম কোন শীতল ছায়ার মত চলে এল বিসরা। মেঘের মত গলায় স্বাহাকে বলল, ঘরে যা বহুজী।

যেন মন্ত্র পড়ল কে। স্বাহা শান্ত হয়ে গেলেন। সভয়ে বললেন, যাচ্ছি।

স্বাহা চলে গেলেন।

বিসরা সোনালির দিকে তাকাল। কাছে এল। বলল, তুই খোকার জন্যে ওর সাথে ঝগড়া করছিলি? খোকার জন্যে?

সোনালি মাথা নাড়ল। বিসরাকে ভীষণ ভয় পায় ও। কেন না বিসরা স্বাহার বিশ্বাসী, মন্ত্রক। নীলের শত্রু।

বিসরা বলল, তোকে আগে বলেছি, আবার বলছি, তুই খোকাকে নিয়ে চলে যা এখান থেকে। কাছে এগিয়ে এল ও। বলল, এ বাড়িতে শয়তান আছে। তোরা চলে যা। চলে যা তোরা।

বিসরা চলে গেল। সোনালি পাথর হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

বাইরে গাড়ির শব্দ। সোনালি তাড়াতাড়ি আঁচল গোছাল। এগিয়ে গেল। নীল ঢুকল। সঙ্গে ওর মামা-মামিমা।

ঢাকাই শাড়ি, সিঁদুর, মামিমাকে প্রণাম করতে না করতে উ... সোনালিকে জড়িয়ে ধরলেন, কপালে চুমু খেলেন। বললেন, সং... সুখী হও।

মামা হাসলেন। বললেন, এই সোনালি? বাব্বা, নীল যখন মাদ্রাজ গেছল এবার, সোনালি আর সোনালি শুনে শুনে আমরা তো· · ·

নীল লজ্জা পেয়ে হাসল। সোনালি ওর দিকে চাইল। নীল বলল, নিন্দে করেছি শুধু।

মামিমা বললেন, ওর নাম নিন্দে? অ নীল! তবে একটু প্রশংসা কর দেখি? শুনে যাই।

মামা বললেন, খুব ভালো। খুব খুশি হয়েছি আমরা।

সোনালি হাসল। বলল, বসুন?

—দাঁড়াও। ভুলেই যাচ্ছি যেন।

মামিমা এক ছড়া হার পরিয়ে দিলেন সোনালির গলায়। বললেন, আমার শাশুড়ী আমায় দিয়েছিলেন। আমি তোমায় দিলাম। ছেলে নেই। নীলই আমাদের ছেলে।

আবার প্রণাম করল সোনালি।

স্বাহা নেমে এলেন নিচে। বললেন, দাদা! বউদি! এসে গেছ তোমরা?

—আসব না? নীলের বউকে দেখব বলে·····

স্বাহা বললেন, কি মিষ্টি বউ এনেছি বল তো? কাছে এলেন, সোনালিকে চুমু খেলেন কপালে। বললেন, ও এসেছে, আমার ঘর আলো হয়ে উঠেছে যেন।

মামা বললেন, তুই ভাল তো মিনি?

—হ্যাঁ দাদা, আজ নীল, নীলের বউ আমার ঘরে, আমার মত সুখী

কে বল? সোনালিকে তো দেখেছ। ওর মত লক্ষী সোনা একটা মেয়ে যদি পায়ে পায়ে ঘোরে, মা বলে ডাকে, তাহলে সুখী না হয়ে উপায় আছে?

সস্নেহ মমতা গলে গলে পড়ছে স্বাহার প্রতিটি কথায়। স্বাহা বললেন, সোনালি! চা দিতে বল মা!

নীল বেল টিপল।

স্বাহা এগিয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন। বললেন, কাঠের আগুন দেখতে কি সুন্দর লাগে দাদা? ছোটবেলার কথা মনে পড়ে? মা কাঠের আঁচে রাঁধতেন? কি ভালোই লাগত কাঠের গন্ধটা তখন? মনে আছে?

—আছে বইকি!

স্বাহা হেলান দিলেন চেয়ারে। স্বপ্ননিমীল চোখে বললেন, নীল! কাঠের বাস্কেটটা?

আগুনে কাঠের কুচি ফেললেন। বললেন, আগুন আমার এত ভাল লাগে, এত ভালো!

১৯৬২ আগস্ট

স্বাহা রায় ভেবে পাচ্ছিলেন না, কি করলে ভাল লাগবে তাঁর হঠাৎ জীবনটা যেন বিস্বাদ হয়ে গেছে।

নীল সব বিস্বাদ করে দিচ্ছে।

নীল নয়, সোনালি।

নীলের সাহস কি, তাঁকে ওই স্বরে কথা বলে? নিচু এবং কর্তৃত্বপূর্ণ গলায়?

নীল তাঁকে বলল, মা! তোমার ওই পুতুলগুলো এবার অন্য কোন ঘরে চালান কর।

কেন, নীল?

খুব উদ্ভট দেখায়।

তার মানে?

খুব অস্বাভাবিক দেখায়।

তোমার তা মনে হতে পারে, কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমি এ রকমই দেখতে ছিলাম।

ছিলে। পাস্ট্ টেন্স্।

আমি জানি নীল. আমি অতীতে সুন্দর ছিলাম। সে কথা আমাকে মনে করাবার দরকার হয় না। আয়নার সামনে বসলেই আমি দেখতে পাই।

সে কথা বলি নি। কিন্তু অতীতের সে চেহারা মমি করে রাখার দরকার কি?

কি করতে চাও?

নষ্ট করে ফেলাই ভাল।

নষ্ট করে ফেলব?

নইলে যে কোন ঘরে গ্যালারি করে রাখ। কলকাতার সব চেয়ে দামী জিনিস তোমার আছে—অনেকগুলো খালি ঘর। যে কোন ঘরে রাখ।

হঠাৎ এ টোন কেন? তুমি যে এ বাড়ির মালিক তা বুঝি মনে পড়ে গেছে?

মুখটা নয় মা, তোমার মনটা ভারি কুৎসিত।

নীল!

ধমক দিয়ে কথা ব'ল না। কথাটা তুললে যখন, জেনে রাখ, এ বাড়ির যা কিছু, বংশসূত্রে প্রাপ্য যা কিছু, সব কিছুর ওপর আমার রাইট সারেনডার করে লিখে দিয়েছি আমি মিত্র অ্যানড মিত্রর আপিসে।

ক্-ক্-কি করেছ?

স্বত্ব ছেড়ে দিয়েছি।

কেন! নীল?

নীল আস্তে বলল, মা! আমার যা ভাল মনে হয়েছে, তাই করেছি।

তুমি আমার কথা একবার ভাবলে না?

ওটা মিউচুয়াল মা। তুমি আমার কথা ভাব নি, হয়তো সম্পত্তি না-নেওয়ার মানে, আমিও তোমার কথা ভাবলাম না। কিন্তু তা বাদ দিলে, কখনো অবজেকটিভলি ভেবে দেখো। আমি খুব অবিবেচক বা স্বার্থসর্বস্ব ছেলে নই।

কিন্তু কেন এ কাজ করতে গেলে?

আমার চাই না কিচ্ছু।

এখন ভাবছ চাই না। পরে?

"পরে" মানে?

ছেলেমেয়ে হলে?

তখনো চাইব না।

না না নীল ! আমি জানি না কেন তুমি এ সব কথা বলছ। কিন্তু সব দরকার হয়।

সকলের থাকে না। আমারও থাকবে না।

ও সব কথা বইয়ের পাতায় থাকলেই ভাল। জীবনে সবই দরকার হয়। তা ছাড়া, এ তো অনলের মাতামহের সম্পত্তি। তাঁর উইলে লেখা আছে, পুরুষ উত্তরাধিকারী সব পাবে। তুমি সব ছেড়ে দিলে......

ড্রামাটিক জাস্‌টিস্‌ মা। বাবা হয়তো তাঁর দাদু-দিদিমার মনোমত "পুরুষ বংশধর" ছিলেন। আমি কারোই মনোমত নই।

কি বলছ ?

এগুলো আমার কথা নয়। এ কথাগুলো তোমার মুখ থেকে এতবার শুনেছি, যে মুখস্থ হয়ে গেছে।

নীল !

আগে মনে ব্যথা পেতাম !—নীল আস্তে পাইপ ধরাল, ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর নিজেকে বলল, কবে থেকে ব্যথা পাই না, তাও ভুলে গেছি।

তুমি না নিলে আমি এ নিয়ে কি করব ?

মা, কতকগুলো অপ্রিয় সত্য মেনে নেওয়াই ভাল।

যেমন ?

বোড়ি-সম্পত্তি, তখনি ভাল, যখন সকলের সঙ্গে সকলের সম্পর্ক ভাল থাকে। ধরো, আমার বিয়েতে তুমি খুব সুখী। আমার ছেলেমেয়ে হলে তুমি খুব সুখী। এ রকমটি হলে আমি এ সব ধরে পড়ে থাকতাম।

আমি সুখী নই ?

সুখী তুমি ? সোনালি অনাথাশ্রমের কুড়োনো মেয়ে, জেনেশুনে বিয়ে দিলে। কিছুদিন বেশ সুখী ছিলে। তারপর, সেই মামা-মামীমা আসার পর থেকে তোমার যে কি হল ! সর্বদা ওকে "অরফানেজের এঁটো পাতা" বল !

না নীল, আর বলব না।

না না, বললে যদি সুখ পাও, বলো। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো মা? তুমি তো সব জেনে নিজেই ওকে নিয়ে এসেছ।

ও যে তোমাকে বদলে দিচ্ছে।

না। যদি বদলে গিয়ে থাকি, নিজেই বদলেছি। আগে ভাবতাম, আমি ছাড়া মার কেউ নেই। উনি এত বড় আঘাত পেয়েছেন! আমি ওঁর জন্যে জীবন উৎসর্গ করব। উনি যা চান, তাই করব। তাই করলাম। মঞ্জীরাকে প্রত্যাখ্যান করা, সোনালিকে বিয়ে করা, স---ব তোমার জন্যে। তাতেও যখন তুমি সুখী নও, তখন ভাবলাম আর ভেবে লাভ নেই। আমি আমার নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মত বাঁচব।

নীল, তুমি আমার ছেলে।

হ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো, ছেলে হিসেবে আমি যদি তোমায় নিরাশ করে থাকি, মা হিসেবে তুমি আমায় কতটুকু দিয়েছ?

আমি, অনল—

হ্যাঁ। মেয়ে চেয়েছিলে। হল না। কুৎসিত একটা ছেলে হল। কিন্তু দেখতে ভালো হল না বলে একটা শিশুর ওপর এত অবিচার করে কে?

তুমি বুঝবে না।

যা যা চেয়েছ, স—ব করেছি। আর কি স্যাক্রিফাইস চাও? আমরা মরে যাই?

আমি নয়, আমি নয়, এই বাড়িটা চায়।

কি চায়?

দুঃখ, জ্বালা, বঞ্চনা, শূন্যতা।

অ্যাবসার্ড।

অ্যাবসার্ড নয়।

অ্যাবসার্ড। একটা ইট-কাঠের বাড়ি, সে চায় দুঃখ-জ্বালা! "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পে হয় মা, জীবনে হয় না। এ তুমি কি বলছ?

বাড়িটা রক্ত চায়।

তুমি অসুস্থ।

না।

ডাক্তার ডাকলে তাড়িয়ে দাও কেন? তুমিও জান তুমি অসুস্থ।

ডাক্তার বিশ্বাস বেইমান। আমাকে বলে মেন্টালি ডিজিজড।

আমিও বলছি। আজকের কথা শুনে আবার বলছি। তুমি ও সব ধারণা ছাড়ো।

আমি ছাড়লে কি হবে? আমাকে স্বস্তি দেয় না কেউ।

কে দেয় না?

যারা মরে গেছে, তারা।

তারা মৃত।

না, জীবিত।

তা হয় না।

তাদের আত্মা জীবিত।

সব ছেড়ে দিতে পার মা?

কি ছেড়ে দেব?

স—ব।

কোথায় যাব?

চল, অন্য কোথাও গিয়ে থাকি।

না নীল, না। এই বাড়িতে···অনল······

বাবা থাকলে তোমাকে সুখী দেখতে চাইতেন।

তাহলে তো সুখীই হতাম আমি।

বড় দুঃখের কথা, আমি তোমায় কিছুই দিতে পারি না। অথচ চেষ্টা করে যাই।

বিয়ে করলে, করলে। ওকে ভালবাসলে কেন নীল? ভালবাসা এ বাড়িতে টেকে না।

তুমিই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু, মা।

স্বাহা রায় বাঘিনীর মত ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরে এলেন। নীলকে ডেকে পাঠালেন।

সোনালি এল। দেখলে গা জ্বলে যায়। বিকেলে স্নান করে চুল খুলে রেখেছে। পরনে তাঁতের শাড়ি। স্বাহা রায় ভেবে পায় না, হেয়ার-ড্রায়ার থাকতে চুল ভিজে রাখে কে! কে তাঁতের শাড়ি পরে বিকেলে? সন্ধ্যায় সিল্ক পরতে হয় তা তো সবাই জানে।

ওকে ডাকছেন, মা?

নীল কোথায়?

কোথায় যেন গেল।

তুমি জান না কেন ডাকছি?

না তো?

কি শুনলাম ক্লাবের লাঞ্চে?

কি?

নীল না কি কাজ খুঁজছে?

খুঁজছেই তো।

সে কথা আমি জানি না কেন?

পেলে বলবে নিশ্চয়।

কাজ করবে, তা আমাকে বলতে পারল না? দশটা আপিস ডেকে কাজ দেবে।

আপনার মতই যে জেদ, মা! যা করবে তা না কি নিজের চেষ্টায় করবে।

আমি বুঝতেই পারছি না কিছু।

ও বলে…

কি বলে ?

আপনি তো নতুন নতুন লোক দিয়ে হোম-অরফানেজ-স্কুল চালাচ্ছেন। ওকে আব দবকাবই হয় না।

বাঃ! আমি যদি ভাল লোক দিয়ে ভাল ভাবে সব চালাতে পারি, তা চালাব না ?

নিশ্চয় চালাবেন।

তাহলে ?

ওর যদি সময় থাকে এত, যদি কাজ কবতে চায়, কাজ খুঁজবে না ? পুরুষমানুষ তো ?

সোনালি !

কি, মা ?

তুমি এ কি কবছ ?

কি কবছি ?

কেন নীলকে বদলে দিচ্ছ ?

আমি ?

আমি তো দেখছি স্বচক্ষে।

না। আপনি ওর দিকে চেয়েই দেখেন না। দেখলে বুঝতেন, ও কত অসুস্থ।

কি হয়েছে ওর ?

সেই পুরনো গ্যাস্ট্রিক।

নীলেব ? গ্যাস্ট্রিক ?

পাঁচ বছর ধবেই তো হয়েছে।

আশ্চর্য। আমাকে কিচ্ছু বলে নি।

আপনিই কি জানতে চেয়েছেন ?

স্বাহা বায় ভীষণ রাগ সাম্‌লে নিলেন। তারপর, সম্পূর্ণ অন্য গলায় বললেন, তুমি নিজে শুরু করেছ কি ? এ বাড়ির সব নিয়ম পালটে দিচ্ছ ?

কি করলাম ?

কিচেনে যাচ্ছ আজকাল, বাঁধছ চাকরদের সামনে। মঙ্গলের মত কুক্ থাকতে রাঁধবার দরকার কি ?

ডাঃ বিশ্বাস যে আপনার ছেলেকে শুধু মাছের ঝোল, তরকারি, সুজির রুটি, এই সব খেতে বলেছেন।

কিচেনে জানিয়ে দাও !

ও যে মঙ্গলের রান্না খেতেই চায় না।

নাঃ, আমার কিচ্ছু বলবার নেই।

সেরে গেলে আবার খাবে।

মঙ্গল বলছিল, তোমরা না কি ব্রেকফাস্টও খাও না ?

ঠিক বলে নি।

মঙ্গল মিছে কথা বলে না।

ঠিক বলে নি। সকালে পরিজ-ডিম-রুটি-মাখন-একটা ফল যথেষ্ট। মঙ্গল রোজ যা পাঠাত, তা নষ্টই হত শুধু শুধু। তাই বারণ করেছি।

ব্রেকফাস্ট খাচ্ছই না ?

খাব না কেন ? নিজেই করে নিই।

ছি, সোনালি, ছি ! আমি নয়, আমার শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ী, কেউ কোনদিন কিচেনে ঢুকি নি।

আমি তো অরফানেজের মেয়ে।

সে তো পদে পদে বোঝা যাচ্ছে।

আপনি মিছে রাগ করছেন। অসুস্থ স্বামীকে একটু রেঁধে দিলে দোষ হয় না কিছু।

শুধু কি তাই ! সেদিন রুস্তমজীদের পার্টিতে তোমরা দুজন যাওনি শুনলাম।

সেদিন তো ওর ভীষণ যন্ত্রণা। পেথিডিন নিয়ে তবে একটু ঘুমোল।

চমৎকার ! এ কথাটাও আমি জানি না।

আপনি তো আজকাল কথাই বলেন না ডেকে। ওর সঙ্গে দরকার থাকলে বাড়ির এ-মহল থেকে ও-মহলে টেলিফোন করেন।

সন্ধ্যায় বেরোত নীল, তাও দেখছি বন্ধ।

শরীর ভাল নেই, মা।

অথচ দাদা-বউদির বাড়ি যাও।

ওকে ওঁরা খুব ভালবাসেন।

দাদা আর বউদি! দাদা তো চিরকাল বউদির গোলাম। বউদিও চিরকাল আমায় হিংসে করেছে।

আপনার দাদা কিন্তু আপনাকে ভালবাসেন খুব।

দাদার কথা হচ্ছে না।

বউদিও।

কি করে জানলে?

আপনার কথা, শ্বশুর মশায়ের কথা কত বলেন।

কি বলে?

কত দিনের কত কথা। শুনতে খুব ভাল লাগে।

ওরা তো আমাকে যেতে বলে না?

বলেছেন তো কতবার।

আসেও না।

এসেওছেন। আপনি থাকেন না সব সময়ে।

কি রকম বাড়ি করেছে?

চমৎকার।

গাড়ি কিনেছে?

গাড়ি তো ছিলই।

ওখানে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে যাও কেন?

যেতে ভাল লাগে।

নীলেরও ভাল লাগে?

বাবাঃ! মামা-মামী তো ওর প্রাণ।

যাও, যাও তুমি সোনালি। আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না।

যাচ্ছি।

নীল !

মা !

শুনে যাও একবার।

আপিসে যাচ্ছি। সন্ধ্যায় শুনব।

না, এখুনি এস।

নীল চুপ করে রইল। তারপর বলল, বেশ,—টেলিফোন নামিয়ে রাখল ও।

সোনালি বলল, কি হল ?

মা ফোন করলেন।

কি বলছেন ?

যেতে বললেন।

যাবে না ?

যাব। কিন্তু…তুমি চল।

আমি গেলে…উনি…আচ্ছা এগোও। আমি আসছি। খাবারগুলো ঢেকে রেখে আসছি।

দেরি কোর না।

সোনালি একটু হাসল। বলল, তুমি এমন কেন গো ? উনি কি তোমায় খেয়ে ফেলবেন ?

অশান্তি করবেন।

না না…

অশান্তি সহ্য করতে পারি না। বুকে কষ্ট হয়। কি বিসরা, কি বলতে এলি ?

বিসরা বলল, তোকে নিয়ে যাব।

মা পাঠালেন?

না না। আমাকে বিশ্বাস করবে না। আমি শুনে নিলাম বারান্দা থেকে।

তাই চলে এলি?

আমাকে ডর খায়। আমি সামনে থাকলে তোকে কিচ্ছু বলবে না।

সোনালি যেন খুব নিশ্চিন্ত হল। বলল, আমি কি যাব না তবে?

কেন, তুইও আয়। শোন্ খোকা, তুই তো চাকরি করছিস। মাইনে পাচ্ছিস।

এখনো পাইনি।

পাবি তো?

তা পাব।

কত টাকা পাবি?

হাজার টাকা।

তাহলে একটা বাসা নিয়ে চলে যা। তোর বাবা তো আমাকে সবসময়ে বলে, বিসরা! খোকাকে চলে যেতে বল্। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বল্।

তোর বহুজী কোথায় যাবে?

ওকে আমি দেখব।

নীল বলল, চল্ বিসরা।

যেতে যেতে বিসরা বলল, কি রকম চাকরি পেলি? গাড়ি কিনবি না একটা?

কটা গাড়ি চাই, বাড়িতে?

বাঃ, তোর আর বউয়ের গাড়ি হবে না একটা?

হবে, হবে।

মা তোকে খেপাবে। খেপিস না।

না।

আগে তো খেপতিস না। এখন খেপিস কেন?

পারি না, বিসরা।

নীল মার ঘরে ঢুকল।

স্বাহা চোখ তুললেন। বললেন, নীল! সর্বনাশ হয়েছে। লতিকার মা অসুস্থ। ও চলে যাচ্ছে।

ওঁর মা তো কলকাতাতেই থাকেন, মা।

আমি তো বললাম, বাড়িতে মার কাছে থাকো লতিকা, যাওয়া-আসা করব। তাতে লতিকা রাজী নয়। মা খুব বুড়ো। তাকে না কি রাতদিন নার্স করতে হবে।

তবে তো মুশকিল।

আমি ভাবছিলাম······সোনালি যদি একটু দেখত। সময়ও তো পায়। গাড়িতে যাবে-আসবে। ঝামেলা নেই।

সে তো ভাল কথা। বলে দেখ।

আরেকটা কথা··

কি, মা ?

তুমি যে আপিসে ঢুকেছ তার এক ডিরেক্টরকে আজ সন্ধ্যায় কাপুরদের সোশ্যাল ইভ্‌নিঙে মিট করছি। তোমাকে ওই স্যালারি দিচ্ছে কেন ?

মা, তুমি আমাকে নিয়ে একটি কথাও বোল না।

কেন, নীল ?

তাহলে আমি কাজ ছেড়ে দেব।

কিন্তু নীল, ওটা কি কোনো টাকা ?

আমি তো খুশি।

স্বাহা হিংস্র চোখে চাইলেন। ঠাণ্ডা, বিষাক্ত গলায় বললেন, সোনালি তোমাকে একেবারে পৌঁতে নিম্নমধ্যবিত্ত বানিয়ে ফেলেছে। তুমি আমার ছেলে ?—

তোমার দুর্ভাগ্য, আমারো।

ঃ সোনালি তোমাকে—

আমি চললাম।

নীল উঠে দাঁড়াল, বুকের কাছটা খামচে ধরল, বিসরার দিকে হাত বাড়াল, ঢলে পড়ল।

বিসরা চেঁচিয়ে উঠত, সোনালি তখনি ঢুকল, বিসরাকে বলল, ডাক্তার বিশ্বাসকে ডাকো।

তারপর সোফায় শোয়াল নীলকে। কোমর ঢিলে করল, বুকে ম্যাসাজ করতে থাকল।

শাস্তা দাড়িয়ে থাকলেন।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গিয়ে সন্ধ্যা এল।

ডাক্তার বিশ্বাস সোনালিকে বললেন, ঠিক আছে। কোনো ভয় নেই আর। সাতদিন বেড রেস্ট।

নীল বলল, চাকরি থাকবে না কাকাবাবু।

না থাকে না থাকবে,—সোনালি ধমকে উঠল।

চটছ কেন?

সেডেটিভ পড়েছে, ঘুমোও।

সোনালি ডাক্তারকে নিয়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। তারপর ধপ করে বেতের চেয়ারে বসে রীতিমত ভ্যা করে কেঁদে ফেলল। ডাক্তার ওকে রুমাল দিলেন। সোনালি মাথা নেড়ে আঁচলে মুখ মুছল, নাক ঝাড়ল।

ডাক্তার বললেন, এটা কিছু নয়। মোর গ্যাস্ট্রিক। কিন্তু একটুও টেনশান ওর সহ্য হবে না।

কি করব আমি?

এত টেনশান কিসের?

আপনি তা জানেন না?

জানি তো…

মা এ রকম করেন কেন?

সে কাহিনী দীর্ঘ, এখন অবান্তর।

মা হয়ে ছেলেকে — এমন ছেলেকে এত কষ্ট কেন দেন? ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে, সেও তো ওঁরই ইচ্ছেয়।

বিয়ে করল বলে তো বেঁচে গেল।

আপনি ওর চিকিৎসা করেন তো। এ রকম উত্তেজনা ওর পক্ষে খারাপ, তা ওঁকে কেন বলেন না?

বলব কাকে? তাহা কি কিছু করবে? নীলকে পাঠাবে বেলভিউতে, হই-চই বাধাবে, নীল চটে যাবে।

বেশ। আমিই ব্যবস্থা করব।

কি করবে?



সোনালি খুব স্বাভাবিক গলায়, পাথরের মত কঠিন হয়ে বলল, ওকে বাঁচাব। আফটার অল, ও আর আমি, দুজনের দুজন ছাড়া কেউ নেই।

স্বাহা ! স্বাহা ! শোনো !

অনল রায় বিপন্ন গলায় ডাকছিলেন।

স্বাহা শুনছিলেন, সাড়া দিচ্ছিলেন না। এখন সকাল দশটা। গাঢ় লাল হাউসকোট পরে স্বাহা ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে হুইস্কি খাচ্ছিলেন। সকাল থেকেই খাচ্ছেন। কয়েকটা কুইক শট্ না খেলে অনলের কথা শোনা যায় না।

স্বাহা !

কি বলছ ?

শোনো।

শুনব কেন ?

খোকাকে ডাকো, সোনালিকে ডাকো।

কেন ডাকব ?

ওরা চলে যাচ্ছে।

যাক্।

ওদের ধরে রাখো।

কেন ?

খোকা চলে যাচ্ছে।

তোমার একটা কথাও শুনব না।

স্বাহা চোখ বুজলেন। বিসরা এসে ছায়ার মত নিঃশব্দে দাঁড়াল ওঁর পেছনে।

স্বাহা বলে চললেন, তুমি তো মরে গেছ। তবে তোমার কথা শুনব কেন ? আমাকে একা রেখে মরে গেলে কেন ? মরে গেছ যখন, তখন মুছে যাচ্ছ না কেন ?

স্বাহা, খোকা চলে যাচ্ছে!

অনল, তুমি কবে চুপ করবে?

খোকা চলে যাচ্ছে।

খোকা, খোকা, খোকা! সোনালি যে সর্বনাশ ডেকে আনল!

মামাকে ধরে চাকরি নিল নীল?

খোকাকে যেতে দিও না।

তুমি জানো, সোনালি আর কি কি করেছে?

কি করেছে তোর? বল্ বন্ধু!

কে, কে? বিস্‌রা!

হাঁ। আজ সকাল থেকে মদ গিলছিস আর বড় খোকার সঙ্গে কথা বলছিস?

বিস্‌রা, তুইও শত্রু হলি?

তোকে আমি ডরাই না বন্ধু।

সোনালি কি করল, দেখলি?

কি করল?

বাড়ি নিল।

এ বাড়িতে তুই ওদের থাকতে দিলি? ওদের হিংসে করলি।

আমি?

হাঁ, তুই। খোকার-বউ তোর পায়ে পড়েছিল, তুই ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলি।

তাই বলে বাড়ি নিয়ে চলে যাবে?

খোকা তোর নজরে থাকলে মরে যাবে।

সোনালির কাছে ভাল থাকবে?

থাকবে।

শুধু কি বাড়ি নিল? একটা ফার্নিচার নিল না। সব না কি ভাড়া করেছে।

খোকা যে এ বাড়ির কিছু চায় না।

আমি বললাম সব সাজিয়ে দিই। খোকা বলল, আমার নীল বলল, কিছু চাই না মা। আমি শুধু সোনালিকে চাই।

সে তো ভাল কথা।

বললাম, তোমাদের বাড়ি কেমন হল দেখ? নীল বলল, তুমিও যেও না, আমিও আসব না। আমাকে না দেখলে তোমার কোনো কষ্ট হবে না। আমাকে তো তুমি কোনদিনই, এক বাড়িতে থেকেও কোনদিনই দেখনি তেমন।

ঠিক কথা বলেছে।

কিচ্ছু হত না বিস্‌রা। সব হল ওই সোনালির জন্যে।

তুই সব নাশ করলি।

তুই বা কি কম? জানিস না বাড়িটা রক্ত চায়? এই শনিবার দশটা মুরগি কাটবি। রক্ত ছেটাবি চারদিকে। নইলে বাড়িটা শান্ত হবে না।

চুপ কর। খোকা এসেছে।

নীল ঘরে ঢুকল। পেছনে সোনালি।

মা, আমরা যাচ্ছি।

সময় হয়ে গেছে?

হ্যাঁ মা।

লাঞ্চের কি করবে?

যা হয় করব।

কিসে যাবে?

ট্যাক্সিতে।

গাড়িটা অব্দি নিলে না।

মা, আমি—সোনালি প্রণাম করল।

এসো।—স্বাহা মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

সোনালি আর নীল বেরিয়ে গেল।

স্বাহা হাতের গেলাস মাটিতে ছুঁড়লেন। কাচ ভাঙার শব্দ শুনলেন কান পেতে।

১৯৬২ ডিসেম্বর

সন্ধ্যে হবার আগেই মিন্টোপার্কের বাড়িতে আলো জ্বলেছিল। শীতের সন্ধ্যে খুব তাড়াতাড়ি আসে। সমস্ত বাড়িতে আলো জ্বলল, নিচে কাচের বাসনের টুং টাং শব্দ। আয়া দরজায় টোকা মেরে গেল, 'মা! ড্রাইভার দাদা বউদিকে আনতে যাচ্ছে।'

—'বিসরা সঙ্গে যাক!'

—'যাচ্ছে।'

সাহা তাড়াতাড়ি ড্রেসিং টেবিলের বাতিগুলো জ্বাললেন। না, শরীরটাকে নিয়ে আর পারেন না উনি। করসেট-অন্তর্বাস-হাজার বাধনের দম বন্ধ করা কষ্টের কথা কে জানে? কে জানে আলমারিতে সার সার খোঁপার কথা? বাঁধানো দাঁত! কনটাক্ট লেনস! এত কষ্ট করেন, তবে তো মানুষ বলে, এখনো কি ফিগার দেখেছ? কি দাঁত?

একদিন বিউটি কুইন হলে বাকী জীবন এত কষ্ট করে চলতে হয় কেন? আজকাল সাহার একেক দিন মনে হয় কিছু করবেন না সকাল থেকে। কিন্তু আয়নায় চাইলে নিজেরই ভয় হয়। একটা চুল নেই মাথায়। কি যে আগুন লেগেছিল, চুলের গোড়া পুড়ে গেল এমন করে। তারপর থেকেই তো পরচুলো ব্যবহারের শুরু। চুল নেই, দাঁত নেই, চোখটা ঘোলাটে, আয়নায় চাইলে দেখেন এক প্রেতিনী।

সেই জন্যই তো সকালে মাসাজ করে গোলাপদি! তারপর পার্লার থেকে আসে জেনিফার। জেনিফার না থাকলে পোশাক পরতেও পারেন না আজকাল। জেনিফার না এলে আজকাল আর সময় কাটে না। জেনিফারের কাছে জেনে নেন সব দরকারী খবর। কে চুল ডাই করছে, কে বিলেত থেকে প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে আসছে, সব।

জেনিফারই তো আজ বলল, জানেন, মিসেস কাপুর কি করছেন আজকাল?

কি করছে প্রমিলা?

—বম্বে থেকে নিজের সব জুয়েলরির নকল করিয়ে আনছে।

—করবে না? চুরি হয় না আজকাল? নকলটা পরবে, আসলটা থাকবে ভল্টে।

—সেই তো মজা। ভল্টে ঢুঁ ঢুঁ।

—কেন?

—কারবারে লালবাতি যে? আসলগুলো বেচে দিচ্ছে।

—বল কি?

—হ্যাঁ।

জেনিফার ওঁকে এই সব খবর দেয়। কলকাতায় কার সর্বনাশ হল, কে নতুন প্রণয়ী-প্রণয়িনী খুঁজছে, সব কথা ও জানে।

স্বাহা সাদা ঢাকাই পরলেন। সাদা জামা। নিশ্বাস ফেললেন। সেই সবই আছে। সমাজ সমিতি—অরফানেজ-হোম-প্রিমিয়ার ফ্লাওয়ার শো—ডগ শো—সব। শুধু নীল নেই, সোনালি নেই।

তাতেই সব ঝিমিয়ে গেছে স্বাহা রায়ের। বেইমানী, কি বেইমানী! অরফানেজের মেয়ে, কাদার পুতুল, ওঁর ইচ্ছেয় উঠবে বসবে, এ বাড়িকে উপহার দেবে বংশজ-বংশজা। কিন্তু কে জানত মেয়েটার ভেতরে ইস্পাত আছে? কে জানত একদিন ও নীলকে এত বশ করে ফেলবে, নীল চলে যাবে মামার সুপারিশে চাকরি নিয়ে? নীল আলাদা ফ্ল্যাট নেবে? প্রত্যেকটি আসবাব ভাড়া করবে? ঠিকে ঝি রেখে কাজ করাবে? সোনালি রান্না করবে?

স্বাহা রায়ের পুত্রবধূর এমন স্পর্ধা হবে? ওঁকে উড়িয়ে দিয়ে ওরা সুখী হবে নির্লজ্জের মত? এত সুখী হবে, যে নীল ওঁকে স্পষ্ট বলবে, কিছু চাই না মা। আমি কিছু নেব না। তুমি যা খুশি সব করতে পার। আমি শুধু সোনালিকে চাই?

এত সুখী হবে, যে নীল ওঁকে বলবে তুমি এখানে এসো না মা, আমিও যাব না। আমাকে না দেখে তোমার কষ্ট হবে না। আমাকে না দেখেই তো তুমি অভ্যস্ত।

স্বাহা শুনছেন, ওরা সন্ধ্যেবেলা দুজনে বাজার করে। নীল বউকে সংসারের কাজে সাহায্য করে। দুজনে সিনেমা দেখে, লেকে বেড়াতে যায়।

বিসরাটা অব্দি কি রকম হয়ে গেছে।

বংশ পুরুষদের কাছে ক্ষমা চান স্বাহা রাতদিন। কি করেন তিনি, কি করেন ? কেমন করে এ বাড়ির প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করেন ? তিনি যে একা। সব করতেন তিনি, সোনালিকে তৈরি করে যেতেন নিজের ছাঁচে।

তাহলে নীল আর সোনালি অসুখী হত, এ বাড়ির ইট কাঠ শান্তি পেত। নীল তো তাঁর দাস ছিল। কিন্তু সোনালি ? ওই কাল সাপ সব নষ্ট করে দিল। স্বাহাকে হারিয়ে দিল মেয়েটা। একবার যদি ওকে কাছে পান, একবার !

নিচে নেমে এলেন স্বাহা। পুতুলগুলোকে আদর করলেন। ওরা কেন প্রাণ পায় না ? যৌবনের স্বাহার প্রতিরূপ অনেকগুলো মেয়ে হয়ে ওরা সোনালিকে ছিঁড়ে ফেলে না কেন ?

স্বাহা নিজের চেয়ারে বসলেন। মেকাপ দিয়ে মুখ ক্লান্ত ও করুণ করেছেন, দুঃখী ও কাতর করেছেন। অসহায়তা ফুটিয়েছেন চোখে। আজ উনি কেঁদে ফেলবেন। মিনতি করে ফিরিয়ে আনবেন নীলকে।

আগুন জ্বলছে ফায়ারপ্লেসে।

আজকাল স্বাহা অনলের ডাক শুনতে পান। যেন বিপন্ন হয়ে অনল বলছে, শোন, শোন, শোন।

কেন ডাকে অনল ? কি বলবে ওঁকে ? এত বিপন্ন কেন ও ? কি শুনবেন উনি ? গয়াতে পিণ্ড দিলে তবে কোন কাজ হয় না ?

এই তো সেদিন বিসরাকে বলতে গেলেন। বিসরা ফস্ করে বলে

বসল. ডাকবে না তোকে? ওর ছেলে বউ চলে গেছে, ওর মনটা ভুখায় না।

যেন মৃতের মন থাকে।

বিসরা বলে, ওদের নিয়ে আয়। ভালবাস ওদের। খোকার ছেলেমেয়ে হোক।

শুনে সাহার সবশরীর জ্বলে যায়।

কিন্তু আজ উনি নীল আর সোনালিকে ফিরিয়ে আনার কথা পাকা করবেন।

ঘণ্টা বাজল বাইরের দরজায়।

ওরা এসে গেছে।

সাহা সোজা হয়ে বসলেন।

বিসরা ঢুকল। মুখ ভাবলেশহীন। দরজা বন্ধ করল।

-ওরা আসে নি?

ওরা এল না।

এ ল- না?

—না।

-- কি বলল?

কিছু বলে নি।

কিছুই বলে নি?

—না।

– তবে, তবে তুই দেরি করলি কেন?

-খোকার বন্ধুরা এসেছে। খাবার এনে দিলাম।

—তোর অপমান হল না?

বিসরা চেয়ে রইল। তারপর বলল,, তুই ওদের নিয়ে আয়। নিজে যা। ওদের ভালবাস।

—আমি যাব?

- যাবি না?

—না বিসরা, না।

-তবে তুই মরে য

—-আমি ?

---তুই মরে যা। ওরা সুখী হবে।

—বিসরা !

—-আমাকে চোখ রাঙাস না বহুজী। আমি তোর সব কথা জানি। বড় খোকা আমাকে স্বপ্নে দেখা দেয়। বলে, বহুজীকে নরম হতে বল বিস

-তুই চলে যা।

--খোকাকে দুধ খাওয়াসনি, কোলে নিসনি। তুই তো এত পাপ করেছিস বহুজী !

—চলে যা তুই।

বিসরা চলে গেল। স্বাহা চেঁচিয়ে উঠলেন, কাঠের বাস্কেটটা কোথায় ? কাঠের বাস্কেটটা ? মোতি। পুষ্প ! চমন ! মহম্মদ ! তোরা কোথায় ?

বেল টিপে চললেন। সতের জন দাস দাসী ছুটে এল। স্বাহা বেল টিপছেন আর চেঁচিয়ে চলেছেন. 'কাঠের বাস্কেট এনে দে। আগুন যে নিভে যাচ্ছে ! তোরা জানিস না আমি আগুন ভালবাসি ?'

১৯৬২-র ডিসেম্বর—সেই সন্ধ্যা

বিসরা সাহাকে বলেছে নীলের বন্ধুবান্ধব এসেছে বলে ওরা এল না। কিন্তু বিসরা নীল আর সোনালির শুভার্থে মিছে বলেছে। বন্ধুবান্ধব কেউ আসেনি। ওরা ইচ্ছে করেই আসে নি। নীলের শরীরটা খুব ভাল যাচ্ছে না। নীলের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ বিশ্বাস এসেছেন।

—তুমি শুয়ে থাক, আমি আসছি।

সস্নেহে নীলের গায়ে কম্বল টেনে দিল সোনালি। পরে ও বেরিয়ে এল বাইরের ঘরে। তুটি মাত্র ঘর ওদের। শোবার ঘরটা খুবই ছোট। কি ভাগ্য বসার ঘরটা বড় সড। ওই একই ঘরে খাওয়া বসা সব। তবে একটি সুন্দর বারান্দা আছে। সেটা ক্যানভাসের পর্দা দিয়ে ঢেকেঢুকে ঘর বানিয়ে ফেলেছে সোনালি। ওখানে নীলের বসার একটা আলাদা জায়গা। আপিসের কাগজপত্র মাঝে মাঝে বাড়িতে আনে নীল। আলাদা কাজের জায়গা নইলে চলে কি?

সোনালি ঢুকল। ডাক্তারবাবু বললেন, এস মা!

—ওকে কেমন দেখলেন?

—ভালই তো।

—ঠিক বলছেন?

—কেন ভয় পাচ্ছ বল তো? ঠাণ্ডা লাগিয়েছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা কি লোকের হয় না?

—বুকে ব্যথাটা করছে কেন?

—সর্দি বসেছে, কেসেছে ঘং ঘং করে।

—সত্যি তো?

—না তো কি?

—আপনি তো জানেন !

—ওর হার্টের কথা ?

—হ্যাঁ।

—না না। হার্ট ভাল আছে।

—কত ভাল আছে ?

—বেশ ভাল আছে। এটা কাশির ব্যথা।

—তাহলে পরশু আপিস যাবে ?

—জ্বরটা না থাকলে একটু ঘুরে আসতে পারে।

—আজ তাহলে স্নান দিই ?

—নিশ্চয়, কেন দেবে না ?

—ঐ ওষুধগুলোই চলবে ?

—হ্যাঁ, তাই চলুক।

—বাব্‌বাঃ, নিশ্চিন্ত হলাম যেন।

—এত ভয় পাও কেন ?

—ভয় পাব না ? একা থাকি, ওর শরীর খারাপ হলে ভয় পাব না ? হঠাৎ যদি বেশি খারাপ হয় ?

—আসলে কি জান মা……

—কি, বলুন ?

—মিসেস রায়ের সঙ্গে না-থাকার ব্যাপারটা……

—আবার আপনি সেই সব কথা বলবেন ?

—না, না ! তোমাদের ওখানে যেতে বলছি না……

—ওঁর নাম করবেন না আমার কাছে।

সোনালির গলা যেন ভেঙে গেল বেদনায়। ঘাড় ফেরাল ও। ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে চাইলেন। সিঁদুরে লাল শাড়ি, হলদে কার্ডিগান, চুল উঁচু খোঁপায় বাঁধা। চোখেমুখে আত্মপ্রত্যয়, এই সোনালিকে এনে তুলেছিলেন ওঁর বাড়িতে ? সেই ভীরু, সলজ্জ, নরম সোনালি ?

ডাক্তারবাবু করুণ মমতায় বললেন, সোনালি, শোন !

—বলুন ?

—আমি তোমাদের শুভার্থী, তা বিশ্বাস কর ?

—হ্যাঁ। ও বলেছে।

ও যা বলে, তাই বিশ্বাস কর ? নিজে বোঝ না ?

-- আমি যে মানুষ চিনি না ?

সে কি ?

আমি তো ওর মাকে ভাল লোক ভেবেছিলাম, মানুষ চিনলে তা ভাবব কেন ?

- না না, একেবারে এতটা খারিজ করে দিও না।

-কেন করব না ? সোনালির গলা নরমই রইল, কিন্তু মন কঠিন হয়ে গেল। বলল, আপনার লয়ালটি থাকতে পারে, আমার নেই। মানে, আপনার লয়ালটি আমার নেই। আমার লয়ালটি আছে, প্রচুর লয়ালটি আছে, উনি না আনলে আমি ওকে পেতাম না।

— সে তো নিশ্চয়ই।

- আর সে জন্যে, ঈশ্বর জানেন, আপনারা দেখেছেন, আমি ওঁর প্রিয় হবার কত চেষ্টা করেছিলাম।

— জানি।

-যদি দেখতাম, উনি ওর পক্ষে শুভ, তাহলে চলে আসব কেন ? কিন্তু ওকে উনি শেষ করে ফেলছিলেন।

-জানি।

না, সব জানেন না। যখন উনি আবিষ্কার করলেন ও আমাকে ভালবাসে, তখন·····

—তখন কি, সোনালি ?

-ওকে বোঝাতে চেয়েছিলেন আমি নষ্ট মেয়ে।

—না।

সোনালি ওর দিকে অনুকম্পায় চাইল। বলল, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ?

— ঘাহা রায় এত নীচ ?

— না, নীচ নন !

সোনালি, সেই অবফানেজের সোনালি, যে ম্যণ্টো পার্কের বাড়ির বাথরুম দেখে টবে কি করে নাইবে, বাথ সলট কি তা ভেবে পায় নি, সেই সোনালি এখন এই পরিস্থিতির শাসক।

আত্মবিশ্বাসে সুকঠিন গলায়, নিরুত্তাপে ও বলল, নীচ উনি নন, কিন্তু উনি অশুভ। আর সে জন্যে আপনিই দায়ী।

— আমি ?

— হ্যাঁ। আপনি তো জানেন, উনি মানসিক বিকারগ্রস্ত রুগী। আপনি না কি ও পরিবারের বন্ধু। নীলের প্রতি ওর অ্যাটিট্যুড ওই পুতুল নিয়ে ন্যাকামি করা, এ সব দেখে আপনি বোঝেননি উনি একটি সাইকিয়াট্রিক কেস ?

— শোন·

— আমি যখন দেখলাম, উনি এত অসুস্থ, এত উচ্ছ্বাস, তখন নীলকে নিয়ে চলে আসি।

শোন সোনালি, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে ওকে নিয়ে যাবার কথা বলেছিলাম বলে উনি খুব রাগ করেন। তুমি জান না···

— কি জানি না ? — ওঁকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে বলি বলে, আর তোমাদের এখানে আসি বলে, ও বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

— সে কি ?

— আজ বছর খানেক ও বাড়িতে যাই না আমি।

— আমি জানতাম না।

— এখন যখন জেনেছ, আমাকে বিশ্বাস কোর।

— করি তো ?

— নীলের ঠাকুর্দার পয়সায় আমার ডাক্তার হওয়া। অনল আমার বন্ধু ছিল। ভগবান জানেন বন্ধুর স্মৃতির প্রতি বিশ্বস্ততায় কি করেছি, আমি, কি করিনি। এই নীল······

—বলুন ?

—নীলের মত ছেলে হয় না। বাইরের জগৎ ওকে ভুল বোঝে না, বোঝেনি। কিন্তু বাড়িতে ওর মা···।

—জানি, সব জানি না।

—দেখ। ওর মন ভেঙে দিতে, ওর পৌরুষ কেড়ে নিতে, কম চেষ্টা করেন নি উনি চিরকাল। নেভার গেভ হিম এনিথিং, নট এ ড্রপ অফ লাভ। তবে হ্যাঁ—

—কি ?

—নীলও অনলের ছেলে। বাঘের বাচ্চা বাঘই হয় সোনালি। নীল অসম্ভব ম্যানলি না হলে কবে ভেঙে পড়ত, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

—বুঝি। কিন্তু······

—বল ?

—ও আর পারছিল না। মরে যাচ্ছিল, ভেঙে পড়েছিলও, তাই ওকে নিয়ে চলে এলাম।

ডাক্তার বাবু দুঃখিত হলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, সোনালি, য্যু আর দ্য বেস্ট থিং দ্যাট কুড হ্যাপ্‌ন টু হিম !

—আমি তো চেষ্টা করি।

—আজ বলে যাই, শাহা রায় যদি শত্রুতা করতে চায়, তবে ভয়ংকর হতে পারে। তুমি সাবধানে থেকো।

—এ কথা কেন বলছেন ?

—দেখ, সী হ্যাজ নেভার লস্‌ট এ ব্যাট্‌ল। ও চুপ করে হার মেনে নেবে ভেব না।

—হার-জিৎ এ ভাবে দেখার কি আছে ?

—তুমি না দেখলে কি হবে ? ও তাই দেখবে। ও তো কোন নর্মাল সেন্টিমেণ্ট বোঝে না সোনালি ? সবই ওর কাছে হয় হার, নয় জিত ! সবই লড়াই। জান ?

কি ?

—আমার মনে হয়, ও ভাল করেই জানে ও অসুস্থ এবং ডেন্‌জারাস্ ফর আদার্স্। অ্যাণ্ড সী লাভস্ টু বি ডেন্‌জারাস ফর আদার্স। গড্! হাউ আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অফ দ্য ওম্যান। আর……

—আর, কি?

—ওই পুতুলগুলো সামথিং সিম্‌বলিক।

—কিসের?

—স্বাহা রায়ের ব্যাধিগ্রস্ত অহমের। যদি ওগুলো ভেঙে ফেলতে পারতো কেউ?

—তাহলে কি হতো?

সী উড হ্যাভ বীন লিবারেটেড ফ্রম দ্য প্রিজ্‌ন—হ্যাট ইজ হার ওন ডিজিজ্‌ড্ সেল্‌ফ্।

—লিবারেটেড?

—হ্যাঁ। স্বাহা রায় একজন ইম্‌প্রিজ্‌ন্‌ড্ প্রিন্সেস। বুঝলে?

—প্রিন্সেস?

ডাক্তার বিশ্বাসের প্রাচীন, প্রবীণ, অভিজ্ঞতা-বিষণ্ণ চোখে এক আশ্চর্য অতীতের আলো জ্বলল আর নিভল।

—হ্যাঁ সোনালি। সী ওয়জ সো বিউটিফুল!

—জানি।

—না, জান না। যৌবনের স্বাহা রায়ের রূপ হয়নি, আর হবে না, না হওয়াই ভালো। আফ্‌টার অল……

—ট্রয়ের হেলেন, পুরাণের ভিনাস, এদের কে আর ফিরে চায় বল? আজকে পৃথিবী ট্যু উইক টু বেয়ার দ্য বার্ডেন অফ সাচ বিউটিজ।

—হয়তো।

—আমি চলি। কিপ স্মাইলিং। আই হ্যাভ ট্রেমেন্‌ডাস রেসপেক্‌ট অ্যান্‌ড অ্যাডমিরেশ্যান ফর য়ু। বি হ্যাপি……অ্যান্‌ড হ্যাভ এ চাইল্‌ড। নীল উইল বি ট্রুলি হ্যাপি। ও…তোমাকে

একটা জিনিস পড়তে দেব। দ্য ট্র্যাজিডী অফ দিস্ মাদার অ্যানড দিস সান, অ্যাজ আই সী ইট।

—আপনি লিখেছেন ?

লিখতাম এক সময়ে। শুনেছি ভালোই লিখতাম। তোমাকে দেব বলে, ও বাড়ি থেকে ফাইনালি বিতাড়িত হবার পর লিখি। তুমিই নাও। ওদের বুঝতে পারবে। নালকে বুঝতে পারবে।

দেবেন।

গুড নাইট।

চলে গেলেন ডাক্তার। সোনালি দরজা বন্ধ করল। শোবার ঘরে এল।

—এই ঘুমোচ্ছ ?

ঘুমিয়ে উঠলাম।

— আমরা কথা বলছিলাম।

মারাথন টক বল।

—তা বলতে পার।

—সব শোনা হল ?

—কি শুনব ? কি বলছ ?

ডাক্তার কাকার প্রিয় টপিক। স্যাড বায় অ্যানড সান।

তুমি বুঝি শুনছিলে সব ?

আরে না না। আমি ওঁকে চিনি না ? পৃথিবীতে একটি কাজই করতে উনি জন্মেছেন এবং সুযোগ পেলেই সেই মিশন ফুলফিল করতে চেষ্টা করেন। কি মিশন বল তো ?

—কি জানি ?

সোনার পাথরবাটি গড়া বলতে পার।

—কেন ?

বাঃ। ওর মিশন কি জান না ? মাকে সুস্থ করবেন, আমার আর তোমার সঙ্গে মার সম্পর্ক সুন্দর করবেন, আমাকে সুখী দেখবেন।

—অসম্ভব বুঝি?

—না না, আসল ব্যাপার যেটা, আমার আর তোমার সুখী হওয়া, সেটা তো ওঁর চেষ্টা ছাড়াই করে ফেলেছি আমরা।

—বাকীটা?

—এই তো বললাম, সোনার পাথরবাটি।

—এই, কি হচ্ছে?

—তোমাকে ভালবাসব না?

—তাই বলে এত?

—ভালবাসার হিসাব চলে বুঝি?

—চলে না বুঝি?

—তোমাকেই তো ভালবাসব। তোমার মত কে আমাকে সব দিয়েছে বল?

—সব আবার কি দিলাম গো?

—স—ব দিয়েছ। তবে তুমি আমাকে এখনি একটা জিনিস দিতে পার।

—কি?

—খেতে দিতে পার।

—ও মা, ভুলেই গিয়েছি।

—তোমার খাবারও আনবে।

—আনছি।

—একসঙ্গে বসে খাব।

—রোজই তো খাই।

—কি খেতে দিচ্ছ?

—তুমি যা চেয়েছিলে, ডাক্তারবাবুও বললেন······

—লুচি ভেজেছ?

—হ্যাঁ, ভেজে আনছি।

—স্যুপ আর লুচি? চল আমিও যাই।

—কি করবে গরমে বসে ?

—তোমার লুচি ভাজা দেখব।

—চল, ছাড়বে না তো। দাঁড়াও, গলাটা জড়িয়ে দিই।

সোনালি মাফলার জড়াতে গেল, নীল ওকে জড়িয়ে ধরল। সোনালির বুকে মাথা রেখে বলল, সোনালি !

সোনালির আঙুল ওর চুলে নেমে এল। গভীর, গভীর শান্তি. গভীর তৃপ্তি, আশ্চর্য অমরার আনন্দ। অনেক, অনেকক্ষণ পরে স্বপ্নাবিষ্ট গলায় নীল বলল, সোনালি, সুখী হতে কি লাগে বলতো ?

—তুমি বল।

—দুজনে দুজনকে সবসময়ে দেখতে পাচ্ছি ব্যস।

—আর আপিস কর যখন ?

—তখনো তো তোমাকে দেখতে পাই। কখনো তুমি আমার চোখ ছেড়ে যাও না।

ডাক্তার বিশ্বাসের লেখাটি সোনালি যথাসময়ে পেয়েছিল।

"সোনালি স্বাহা রায়কে আমি ভালবাসি না। নীল আমার সন্তান নয়। কিন্তু আমার ট্রাজিডী হল, ওদের জীবনটা যেন আমাকে গ্রাস করে আছে। আমি সে বন্ধন থেকে বেরোতে পারি না। এই আরেক দৃষ্টান্ত, এই আমি, মানুষ আসলে কি জটিল। স্বাহা রায়কে আমি ভালবাসি না। স্বাহা রায় যখন আগুনকে মুখের আধখানা দেননি তখন বহুজনের মত আমিও ওঁর রূপ দেখে ওর রূপের ক্রীতদাস হই। বিশ্বাস কর, আমার মনোভাবে কোথাও ওর ঘনিষ্ঠ হবার বাসনা ছিল না।

"কেন না ওর রূপ এত প্রচণ্ড, এত নিখুঁত, এত উচ্চস্তরের যে সে রূপকে সকল রূপের অ্যাবস্ট্রাক্ট বললে যেন ঠিক বলা হয়। অত রূপকে ভালবাসা যায় না। অত রূপ ভয়াবহ। অত রূপ অস্বাভাবিক। তাই তাকে ভয় হয়।

"অত রূপকে নিজের ঘরের শয্যায় ভাবা অসম্ভব। হেলেন বা

ভিনাস বা আফ্রোদিতি বা উর্বশী, এদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত চিন্তা আসা সম্ভব নয়, বিশেষ করে আমার মত মানুষের পক্ষে। কিন্তু আমার বন্ধু অনলের পক্ষে সম্ভব। ওই রূপ দেখে ও পাগল হয়। বিয়ে করে ঘরে এনে তুলল। যে কয় বছর বাঁচল, ঈর্ষায় জ্বলে জ্বলে বাঁচল। তারপর? লাইক এ ব্যাড সিম্বল, অনল আগুনের কারণে মরল।

"স্বাহা রায়কে আমি বলি বন্দিনী।

"চোখে দেখিনি, শুনেছি, হিমালয়ে চির তুষার রাজ্যে কোথাও একটি হ্রদ আছে। প্রতি পঞ্চাশ বছরে তার ওপরের বরফের সর গলে। চার বার তুষার গলতে লাগে দুশো বছর। পঞ্চম বার, আড়াইশো বছরে একবার সে হ্রদে একটি ফুল ফোটে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, একদিন তার আয়ু। অথচ সে ফুলের মত রূপে সৌরভে অতুলন কোনো ফুল না কি পৃথিবীতে কোথাও ফোটে না। সূর্য ছাড়া সে ফুলকে কেউ দেখেনি, কেন না সে হ্রদ দুরধিগম্য।

"স্বাহা সেই ফুলের মত। অনল ভালবাসবে বলে কিছুদিন ও রক্তমাংসের মানবী হয়েছিল। অনল মরে গেল, স্বাহা আবার হয়ে গেল অ্যাব্‌সট্রাক্ট। কিন্তু পৃথিবীতে ওর যে একমাত্র পাথেয়, ওর রূপ তার সঙ্গে সঙ্গে চলে মানবিক যা কিছু।

"ওর ক্ষত গালে নয়, মনে। ওর মনে ক্যান্‌সার সোনালি, ও জীবন্ত ক্যান্‌সার।

"অ্যাজ এ মাদার, সী ইজ এ টোটাল ফেলিওর। নীলের হওয়া উচিত হয়নি। নীল ওর জঠর অধিকার করে বলে ওর প্রতিরূপা নীলাঞ্জনা হয়ে রইল ল্যামের সেই ড্রীমচাইল্ড।

"স্বাহার প্রথম আক্রোশ নীল জন্মাল কেন। আর জন্মালই যদি, তাহলে আরেক অনল রায় হল না কেন। অনল রায় হল না যখন, তখন তবু কেন ওর ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ও কেন সম্পূর্ণ মানুষ হল।

"তারপর নীলকে হঠাৎ একদিন প্রয়োজন মনে হল ওর। হঠাৎই বোধ হয় মনে পড়ল স্বাহা রায় হলেও চিরজীবী হওয়া যায় না।

তখন মনে হল সুখ নয় অসুখের, তৃপ্তি নয় অতৃপ্তির, আনন্দ নয় দুঃখের এক লিগেসি ও নীলকে দিয়ে যাবে।

"বউ আনবে নিজে। বউকে কবজা করে রেখে দেবে। ছেলে মেয়ে হলেও নীলের একান্ত আপন হতে দেবে না কাউকে। এ রকম ভাবা যে অসুস্থতা, তা ওকে কেউ বলে দেয়নি।

"ও ভাবেওনি, ওর এই পরিকল্পনা তুমি ভেস্তে দিতে পার। তোমাকে কেন, কোন মেয়েকেই ও নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেনি। ওর বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, নির্মমতা যে কোনো একটি মেয়ের থাকতে পারে না, তা ও জানত। ও জানত, ওর সকল আয়ুধ আছে।

"কিন্তু ও ভাবতেও পারেনি একটি মেয়ের আরো আয়ুধ থাকতে পারে। বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, প্রখরতা, নির্মমতাকেই ও সব ভেবেছিল।

"তুমি স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, ধৈর্য, সেবা, সহিষ্ণুতা দিয়ে ওকে হারিয়ে দিলে। নীল সুখী হল। আমি চাই তোমাদের কাহিনী এখানেই শেষ হোক। নীলকে অসুখী স্নেহমমতাবঞ্চিত, চিরদুঃখী দেখেছি, আর দুঃখ পেয়েছি। ও সুখী হোক, তুমি সুখী হও।

"ভয় পাই, কাহিনীটাকে এত সুন্দর হয়ে শেষ হতে দেবে না স্বাহা রায়।

"তোমাকে সাবধানে থাকতে বলে সোনালি। তুমি জান না ও কত ক্রুর হতে পারে। কত নির্মম।

"আর নীল!

"নীল জানে না ভালবাসা-স্নেহ-মমতা কাকে বলে। শুধু রোদে চারাগাছ বাঁচে না, জল আর ছায়া যদি না পায়। নীল যে তবু বেঁচে আছে স্বাভাবিক হয়ে, এ শুধু অসীম জেদের বশে।

"ও যাকে বিয়ে করবে, তার কথা ভেবে আমি চিরকাল দুঃখ পেয়েছি। ভয় হত, যা যা ও নিজের মার কাছে পায়নি, তা অন্য কেউ দিলে ও নিতে পারবে কিনা।

"সাইকিয়াট্রিষ্ট বন্ধু, স্বাহাকে যাঁকে দেখাবার ইচ্ছে ছিল, তাঁকে

জিগ্যেস করেছিলাম। তিনিও বলেছিলেন, যা স্বভাবিক তা হল, নীল তাকেই বিয়ে করতে চাইবে যে কোন না কোন ভাবে ওকে মার কথা মনে করায়। তার বিষয়ে প্রবল প্রতিরোধ থাকবে ওর। মা ওকে যা যা দেননি, ও তার কাছে তাই তাই চাইবে। এবং একই সঙ্গে যেই ও তার কাছে সেই স্নেহ মমতা-সহিষ্ণুতা পাবে, সেই রিঅ্যাক্ট করে যাবে।

"বলেছিলেন, আই পিটি দ্য গার্ল হু উইল ম্যারি হিম।

"কিন্তু তুমি সে হিসেবও পাল্টে দিলে। আর তোমাকে যে নীল সম্পূর্ণ মেনে নিল, তাতে প্রমাণ হয়ে গেল ও অনেক, অনেক বেশি হি-ম্যান ওর বাবার চেয়ে। অনল, স্বাহার সঙ্গে থেকেও, যে নিজের নিজস্বতা বজায় রাখতে পেরেছিল, তার একমাত্র কারণ, স্বাহা ওর শত্রু ছিল না। নীলকে আমি বেশি কৃতিত্ব দিই, কেন না নীল স্বাহার চূড়ান্ত প্রতিরোধের আগুনে জ্বলে যায়নি, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। স্বাভাবিক ও সুন্দর একটি মানুষ হতে পেরেছে। ওর সংগ্রাম, সত্তা রক্ষার সংগ্রাম অনেক কঠিন ছিল।

"অনেক কথাই মনে পড়ে।

"নীলের টাইফয়েড, কিন্তু স্বাহা ওর য়ুরোপ বেড়াতে যাওয়া বন্ধ করতে পারল না। আমাকে আর আমার স্ত্রীকে ন' বছরের ছেলের ভার দিয়ে চলে গেল।

"মনে পড়ে প্রতি বছর ছেলেটা প্রাইজ পেত। কোনবার প্রাইজ নেবার ফাংশানে ওর মা যেতে সময় পায়নি।

"সারা বছর ছেলের খোঁজ রাখত না, কিন্তু জন্মদিনে বিরাট ফাংশান করত। অনেক খরচ করত। অনেক খরচ না করে কিছু করা যায়, স্বাহা আজও বোঝে না। নীলের সংগ্রাম অনেক কঠিন ছিল।

"তাই বলি, নীলের জীবনে তোমার মত সুসংবাদ কিছু ঘটেনি। তুমি প্রথম দানে জিতেছ। জিতেই যাও, কামনা করি।

"শেষে বলি, নীল অনেক ভাল আছে এখন। তবে হার্টটা ওর দুর্বল। ছোটবেলায় অসম্ভব অবহেলার কারণে। ভাল থেকো।"

সকালবেলাই বিসরা চলে এল নীল ও সোনালির বাড়ি

সোনালিকে বলল, স্নান করেছিস ?

--কেন ? এত সকালে স্নান করব কেন ?

বিসরা বলল, তবে চা কর।

—বোস একটু।

—কি করছিস ?

--ওর খাবার।

—কোথায় গেছে ?

—ডাক্তারের কাছে।

--কেন ?

—কাজ আছে।

বিসরা বলল, কি খাবার করবি ?

—পরোটা ভাজছি।

—খোকা পরোটা খায় ?

—খুব।

—আগে খেত না।

—এখন খায়। তুমি খাবে ?

--না, চা দে।

—এই নাও।

—শোন্, এই ফুলটা রাখ্।

--কেন ? কিসের ফুল ?

—পূজো দিয়েছি সকালে তোদের জন্যে।

—কোথায় পূজো দিলে ?

—কালীঘাটে।

—বাব্‌বা, সকালে পূজো দিয়ে চলে এলে?

—তোর আর খোকার জন্যে।

—বিসরা!

—বল?

—তোমার বাড়িতে কেউ নেই?

—সবাই আছে।

—বাড়ি যাও না তুমি?

—না।

—কেন?

—তোদের ছেলে হোক তবে যাব।

—বাঃ, ওকি একটা কথা হল?

—ওকে কোলে নিয়েছি, ওর ছেলেকে কোলে নেব।

—তুমি ওকে খুব ভালবাস?

বিসরা কি ভাবল, তারপর বলল, তোর শ্বশুরটা খুব ভাল লোক ছিল রে। তাকে আমি রোজ স্বপ্ন দেখি।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ রে। দাদাবাবু বলে, বিসরা, চলে আয়।

—তোমাকে খুব ভালবাসতেন?

—খুব। জানিস, তোর শ্বশুর কেমন ছিল?

—তুমি বল।

—রাজার মত চেহারা ছিল রে। আমাকে নিয়ে শিকারে যেত। সব জায়গায় যেত।

—আর কি?

—স্বপ্নে আমাকে ডাকে।

—স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

—বলে, বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। খোকাকে নিয়ে আয়।

—থাক বিসরা ও কথা।

—না না, আমি কি তোকে যেতে বলছি ?

—আমি যাব না।

—যাবি কেন। তোরা ভাল থাক্।

—তুমি যে এখানে আস, উনি জানেন ?

—না।

—জানেন যদি ?

— জানলে কি হবে ?

--কিছু বলবেন না ?

– আমাকে ?

—তবে আর কাকে ?

—আমাকে ভয় পায় কত !

—তোমাকে ভয় পান তা দেখেছি। কিন্তু কেন ?

—আমাকে ভয় পাবে না ?

—কেন ভয় পাবেন ?

সে পরে বলব একদিন।

— উঠছ কেন ?

—বা, তোরা আজ যাবি যে।

—তাতে কি ?

- বাব বা, কত রকম খাবার হবে।

—তাতে তোমার কি ?

—ব্রয়লার চিকেন কিনব।

—তুমি তো রাঁধতেও পার বিসরা।

—পারি বই কি !

—কি কি রাঁধতে জান ?

—সব।

—আমায় শিখিয়ে দিও।

—দেব।

—উঠছ ?

—হ্যাঁ, যাই।

দাঁড়িয়ে পড়ে যাবার আগে বিসরা বলল, তোকে দেখলে তোর শ্বশুর খুব খুশি হত।

—কি করে জানলে ?

—জানি।

তারপর বিসরা বলল, এই খুব ভালো হল রে।

—কি ?

—এই যে তোরা ও বাড়িতে আর যাবি না থাকতে।

—ভালো হল ?

—হ্যাঁ রে। বাড়িটা ভালো নয়। এদের পয়সার খেলা অনেক দেখলাম। সুখ পেতে দেখলাম না কাউকে।

—এ কথা তুমি আগেও বলেছ।

—বাড়িটার নিঃশ্বাসে বিষ আছে।

বিসরা চলে গেল। সোনালি মাথা নাড়ল, হাসল। আজ কাল সব কিছু ভাল লাগে সোনালির। সব কথায় হাসতে ইচ্ছে করে। একেকটা দিন এমন হয়। আজ শাহার কাছে যেতে তার কোনো আশংকা নেই। আর কিছু করতে পারবেন না শাহা ওদের, সোনালি আর নীল ওঁর মুঠোর বাইরে চলে গেছে।

আজ সকালে সোনালি বুঝেছিল, শাহা সম্পর্কে ওর কোনো উত্তাপও নেই আর। মনে মনে ভেবে দেখেছিল ও, শাহাকে কোনো হিংস্র রক্তপিপাসু ডাইনি মনে হচ্ছিল না।

বরঞ্চ সহানুভূতি হচ্ছিল। শাহা রায়কে মনে হচ্ছিল নিঃসঙ্গ, হতভাগা এক বৃদ্ধা।

সব চেয়ে ভালো কথা, নীল মাকে দেখতে যাবে জেনেও ভেতর থেকে গুটিয়ে কঠিন হয়ে যায়নি। বরঞ্চ নীলই বলল, ওর জন্যে কি বুনছিলে, হয়ে গেছে ?

সোনালি উঠে পড়েছিল। কিন্তু নীল ওর আঁচল শক্ত করে চেপে ধরেছিল। বলেছিল, আজ কোন কথা শুনছি না। চুপ করে শুয়ে থাক তো?

—চা খাবে না?

—আমি করছি চা।

নীল হীটার জ্বেলেছিল, চা করেছিল, ট্রেতে চা সাজিয়ে নিয়ে চলে এসেছিল। আজই সকালে।

এখনো সকাল। তবে এখন সকাল দশটা, তখন ছিল সকাল সাতটা। নীল চা করে এনেছিল, দুজনে বসে খেয়েছিল ধীরে ধীরে। আজ সকালেই অনেক কাজের কথা আলোচনা করে নেওয়া হয়েছিল।

আজ নীল বাড়ির কথা পাকা করতে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা ভালো বাড়ির খোঁজ পেয়েছে ওরা। বাড়টা এ বাড়ির চেয়ে সুপরিসর। ঘর একখানা বেশি। খুব চেনাজানার ভেতর থেকে পেয়েছে ওরা বাড়িটা।

সোনালি চা খেতে খেতে ভাবছিল, গত ছ' মাসে কত কী না ঘটল! ইনস্টলমেণ্টে ওরা ফ্রিজ কিনল, সে টাকাও শোধ হল। নীল একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি দেখে এসেছে, সেটাও কিনবে।

চা খেয়ে নীল বেরিয়ে গেল। বিসরা এল। সোনালি এখন ওদের খাবারটা গুছিয়ে টেবিলে নিয়ে এল। তারপর হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে।

চেয়ারের পিঠে, টেবিলে ওর হাতের কাজ করা ঢাকনী। পর্দাগুলোতে ওরই হাতের বাটিক কাজ। নীলের বসার চেয়ারে সোনালির হাতের চামড়ার কাজের গোল কুশন।

ওর আর নীলের ঘর······ওর আর নীলের······ওর আর নীলের ······ভুরু কুঁচকে সোনালি ভাবতে শুরু করল, এত অসম্ভব সুখী আর আনন্দিত হবার অধিকার ওর আছে কি না।

হঠাৎ চমকে উঠল ও। নীল দাঁড়িয়ে দরজার কাছে।

—এই। কখন এলে ?

—এখনি।

—ঢুকলে কি করে ?

—চাবি দিয়ে।

ওমা, শুনতে পাইনি তো ?

মন কোথায় থাকে ?

যেখানে থাকার।

কি কি কাজ করে এলাম, জান ?

—বল, দাঁড়াও একটু।

—কেন, আবার কি হল ?

—হাতটা ধোও। খেতে এস। খেতে খেতে কথা বল।

—মাষ্টারী কোর না তো ?

—এই, হাত না ধুয়ে খাচ্ছ ?

—বেশ করছি। হাত না ধুলে বুঝলে, একটু একটু আঙুলের ময়লায় খাবারের টেস্ট অন্যরকম হয়।

—ইশ্ কি নোংরা।

—শোন, বাড়িটা বেশ ভালো।

—কথা বলে এলে ?

—হ্যাঁ। জানুয়ারিতে হচ্ছে না, ফেব্রুয়ারি থেকে নেব।

—দেরি হবে কেন ?

—কিছু কিছু মেরামত করতে হবে।

—বাথরুমটা ?

—হ্যাঁ, সে তো আছেই। বারান্দাটায় গ্রীল দিয়ে দেবে।

—একটু তরকারি নাও।

—নিচ্ছি। আর কোথায় গেলাম জানতে চাইছ না যে ?

—আর কোথাও গিছলে না কি ?

—কি হল, চোখ তুলে চাইতে পারছ না যে

—কি আবার হবে ?

নীল বলল, তাকাও।

সোনালি তাকাল।

নীল বলল, ইয়েস !

সোনালি লাল হয়ে গেল।

নীল বলল, সুজয় বলল, তোমাকে নিয়ে যেতে। কি সব টনিক না কি এ সময়ে খাওয়া ভাল।



সোনালি চুপ করে রইল। দুজনেই গম্ভীর হয়ে গেছে ওরা। দুজনের মুখ থেকেই হাসি মুছে গেছে। দুজনে দুজনকে দেখছে।

সোনালি আস্তে বলল, তুমি খুশী হয়েছো।

নীল মাথা নাড়ল।

সোনালি আর কথা বলল না।

নীল বলল, এত খুশী হয়েছি সোনালি, যে আজ বোধ হয় আমি মাকেও ক্ষমা করতে পারি।

সন্ধ্যে হবার আগেই নিচের পার্কের বাড়িতে আলো জ্বলেছে। আর শীতের সন্ধ্যে খুব তাড়াতাড়ি আসে। সমস্ত বাড়িতে আলো জ্বলল, নিচে কাচের বাসনের টুং টাং শব্দ। বিসরা দরজায় টোকা দিল।

— 'বহুজী, খোকারা এসে গেল।'

—'আসছি!'

স্বাহা রায় আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। খুব সমালোচকের চোখে দেখলেন নিজেকে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন, অনল ওকে কি বলতে চাইছে।

আজকাল উনি সব সময়ে অনলের গলা শুনতে পান, অনলের সঙ্গে কথা বলেন। বিসরা বোঝে না, কেউ বোঝে না, অনল ওর সঙ্গে কথা বলে। তাই উনি যখন কথা বলেন, ওরা ভাবে উনি পাগল হয়ে গেছেন। ডাক্তারও তাই ভাবে। ঘেন্নায়, তাচ্ছিল্যে স্বাহা রায়ের ঠোঁট কুঁচকে গেল। পাগল উনি? পাগল হবেন কেন? অনল, ওর স্বামী, অনলের সঙ্গে কথা বললে সেটা পাগলামি হয়ে গেল? কেন? অনল মরে গেছে বলে? এত বোকা সবাই! স্বাহাও তো ভেবেছিলেন, মরে গেলেই সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু অনল যদি মরেও না মরে, যদি ওঁর অন্তরের অন্তরে অবাধ্য, উদ্বিগ্ন, কাতর একটা কণ্ঠস্বর হয়ে বেঁচে থাকে, স্বাহা কি করবেন?

— অনল কি বলছ?

- স্বাহা! স্বাহা! স্বাহা!

—এই তো আমি!

—তুমি নিচে যেও না।

—কেন?

—নীলের কাছে, ওর বউয়ের কাছে যেও না !

—ওরা এসেছে যে ?

—যেও না।

– ওরা এসেছে যে, শুনছ না ?

—তুমি নেম না। ওরা চলে যাবে।

– চলে যাবে না আর, অন্তত সোনালি যাবে না।

—আহা !

—ধমকাচ্ছ কেন ?

– আমি কি বলছি শোন।

—কোথায় তুমি ?

– এই তো।

—হ্যাঁ, অনল এখন তাঁর সামনে। অনল, বত্রিশ বছর বয়স, পরণে শীতের পোশাক, কিসের ঝাপটা বাতাস থেকে সরাচ্ছে আঙুল দিয়ে, নিশ্বাস নিচ্ছে কষ্ট করে, চোখ কুঁচকোচ্ছে, বুঁজছে বারবার, ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে ওর।

—কি হল, অমন করছ কেন ?

—বাতাসে গ্যাস স্বাহা, বাতাসে গ্যাস।

—বাতাসেই তো গ্যাস থাকবে।

—কষ্ট হচ্ছে।

—বাতাসে গ্যাস থাকবে না ?

—তোমার মিনি-কিচেনে গ্যাসের সিলিণ্ডার সামান্য খুলে রেখেছ। সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করেছ। খুব করে সুগন্ধ স্প্রে করেছ বাতাসে। তাই গ্যাসের গন্ধ চট করে টের পাওয়া যাচ্ছে না।

—কারেক্ট !

—সোনালিকে যেতে বলবে ও ঘরে, কফি করতে বলবে !

—করেক্ট।

—সোনালি যেই দেশলাই জ্বালবে, জ্বলে উঠবে বাতাস।

—ইয়েস। ঠিক বলেছ।

—কিন্তু শোন স্বাহা, এ কাজ কোর না তুমি।

—তাহলে কি করব?

—শোনো, ওদের বের করে দাও। তারপর তুমি যাও তোমার মিনি-কিচেনে। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও। তুমিই দেশলাই জ্বালো।

— তারপর?

— তুমি তো জান তাতে কি হবে। সব জ্বলবে। আর, যখন সব জ্বলবে, যখন সবাই দমকল ডাকবে, দরজা ভাঙবে, ডাক্তার আনবে, অ্যাম্বুলেন্স ডাকবে, ততক্ষণ তুমি আমার কাছে চলে আসবে।

—এই চাও বুঝি?

হ্যাঁ স্বাহা। যা করতে যাচ্ছ তা কোর না। তুমি যেও না।

—যাব।

—স্বাহা, নীলের কথা ভাব।

—আর কার কথা ভাবি বল? এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে। তারপর সোনালি মরে যাবে। তারপর নীল একলা হয়ে যাবে। তারপর নীল আমার কাছে আসবে। তারপর আমি ওকে আবার বিয়ে দেব। তারপর নীল আমার হাতে চলে আসবে।

— না, স্বাহা, না!

—আমি তোমার কথা শুনব না।

— স্বাহা! স্বাহা! স্বাহা!

—চলে যাও তুমি!

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন স্বাহা রায়। আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, বেরিয়ে যাও! তুমি তো প্রেত। কবে মরে গেছ তুমি! যেখান থেকে এসেছ, সেখানে চলে যাও! লজ্জা করে না? মরে গেছ কবে, সব দায়িত্ব দিয়ে গেছ আমার উপর, এখন আমাকে বলতে এসেছ সোনালিকে কিচেনে যেতে বল না!

এত জোরে চেঁচালেন স্বাহা. বিসবা ছুটে এল, আযা ছুটে এল।

বিসবা বলল, কার সঙ্গে কথা বলছিস বহু ?

--তোর দাদাবাবু।

কোথায় কে ? তুই তো একা।

ওই তো। দেখ, দেখ, চ'লে যাচ্ছে।

আযা আর বিসবা পরস্পরের দিকে চাইল। বসবা আড়ল তুলে আযাকে বের করে দিল।

শান্ত হলেন স্বাহা। বললেন, চলে যা।

কেন ?

-আমি বলছি বলে।

বেশ, থাকব না।

- আজ আর কাউকে চাই না। শুধু নীল আর সোনালি আর আমি কথা বলব।

তাই হবে, নীচে চল।

চল।

খোকাকে বকিস না বহু।

না বকব না। তোকে তো বলেছি সে কথা।

— বড়কে বকিস না।

না

স্বাহা তাড়াতাড়ি নেমে এলেন।

নীচের ঘরে সোনালি আর নীল। নীলকে জড়িয়ে ধরলেন আগে, পরে সোনালিকে। বললেন, রাগ পড়ল ?

না রাগ কে করেছে ?

-বাব্বা, দু বছর বাদে বাড়িতে এলে নীল।

ও সব কথা থাক মা।

-না না, আমি তো কোন কথা বলছি না। সোনালি কি সুন্দর হয়েছে দেখতে ?

সোনালি আর নীল চোখে চোখে চাইল। নীল বলল, মা, কি ব্যাপার বলতো ?

কি ব্যাপার নীল ?

-সব দিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

—তুমি তো নিলে না কিচ্ছু।

-না মা, আমার দরকার নেই।

— বাবার ছবিটা অব্দি রাখলে না।

ছোট্ট বাড়ি, মা !

- তোমার বাবার নামে বাচ্চাদের ক্লিনিক হচ্ছে এ বাড়িতে। সে খুব ভালো হবে। তাই না ?

খুব ভালো।

সোনালি হঠাৎ বলল মা, তোমার পুতুলগুলো ?

— ফেলে দিয়েছি।

ফেলে দিলে ?

-সার্ভিস ফ্ল্যাটে চলে যাচ্ছি সোনালি, সেখানে এত হাবিজাবি রাখার জায়গা কোথায় বল ?

— সে ফ্ল্যাট ভাল তো ?

—খুবই ভালো।

—একেবারে একা।

না না, আয়া থাকছে, বিসরা ও ড্রাইভার থাকছে, গাড়ি রাখছি।

-সে বড় ভালো।

—আর তোমরা তো রইলেই।

নীল আর সোনালি আবার চোখে চোখে চাইল। কি যেন বলছে ওরা পরস্পরকে, সোনালি লজ্জা পাচ্ছে। নীলকে কি বোকার মত সুখী সুখী দেখাচ্ছে।

নীল বলল, এতবার বললাম সব দিয়ে দাও মা ! একটা বড় বাড়ি নিই। কাছে এসে থাক।

—তোমরাও তো এলে না নীল !

—না মা, এ বাড়িটাই ভালো নয়। এখানে কেউ সুখী হয়নি কোনদিন।

—না নীল, সে কথা ঠিক নয়।

—জানি মা, তুমি আর বাবা··

—হ্যাঁ।

—কিন্তু বাবাও তো থাকলেন না।

—সে কথা সত্যি নীল !

স্বাহা মাথা নাড়লেন। সোনালি আর নীল দুজনেই আশ্চর্য অভিভূত। এ কোন স্বাহা ? এত স্বাভাবিক, আন্তরিক, অন্তরঙ্গ ? সোনালির মমতা হল। ওঁর হাতে হাত রাখল। বলল, রোগা হয়ে গেছ মা।

—খুব পরিশ্রম গেল তো।

—এই বাড়ি তোলা, পরিশ্রম তো হয়েছেই।

—বাড়িটা আমার প্রাণ ছিল তো !

—খুব খারাপ লাগছে, তাই না ?

—লাগছিল সোনালি, এখন আর লাগছে না।

নীল বলল, মা তুমি বদলে গেছ।

—বদলে গেছি ? তাই না কি ?

—খুব বদলে গেছ।

—কি রকম, নীল ?

—কি রকম নরম হয়ে গেছ। কত সুন্দর ! কত কাছে এসে কথা বলছ !

—ভালো লাগে নীল ?

—খুব।

—সত্যি ?

সোনালি বলল, তোমাকে এত লিখি, আসতে বলি, তুমি আস

না। তাতে তোমার ছেলের কি দুঃখ তা তো জান না। শুধু বলে··· এই, বলে দেব ?

—বল না সোনালি, নীল কি বলবে ? তুমি বল।

—বলে কি জান ? সোনালি, আমার তো মোটে একটা মা! মাকে কাছে আন।

—বলে বুঝি ?

—বলেই তো।

—তুমি কি বল ?

—আমি তো বলি। আমিও বলি, ও-ও বলে। কেন, মামা বলেন নি ?

—দাদা ? দাদা এখানে না কি ?

—হ্যাঁ তো! এখানে বাড়ি করলেন।

—কোথায় ?

—দমদমে। প্রতি রোববার ওঁরা আসেন তো।

—আমি জানি না।

—আমরাও যাই। খুব ভালো লাগে।

—দাদার সঙ্গে নীলের কথা নিয়ে রাগারাগি করেছিলাম তো! তাই দাদা আর আসে না।

—এলে বলব।

—সে বোলখন। শোন নীল, যে কথা আগে হচ্ছিল। এ বাড়িতে, তোমরা যাবার পর ভেবে ভেবে দেখেছি, সত্যিই সুখী হয়নি কেউ।

—আমারও সেই কথা।

—তাই ভাবলাম, তুমি যখন নেবেই না, তখন ভাল কাজ হোক একটা।

—ভালই করেছ।

—তুমি খুশী তো ?

—খুব। একটু জল খাব

—দাঁড়াও, এনে দিই।

—তুমি এনে দেবে কেন? ওরা কোথায়?

—বিসরা ওর ঘরে, ড্রাইভার বাইরে। ওদের সব ছুটি দিয়েছি আজ।

—কেন?

—এই নিজেরা গল্প করব বলে।

স্বাহা উঠলেন, জল এনে দিলেন। নীল বলল, সোনালি! মা আমায় নিজে হাতে জল দিলেন।

স্বাহার মুখ বেদনায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আস্তে ভাঙা গলায় বললেন, নীল!

—না না, কিছু ভেবে বলিনি।

স্বাহা স্বাভাবিক হলেন, হাসলেন। বললেন, থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে এস, রেঁধে খাওয়াব।

—তুমি রাঁধতে পার, মা?

—পারি সোনালি! ওর সঙ্গে যখন ট্যুরে যেতাম, রাঁধতাম। ও রাঁধতে দিতে চাইত না অবশ্য।

—মা জান, সোনালি রাঁধতে জানতই না।

—বাঃ, কোন দিন রেঁধেছি না কি?

—আমি সব শেখালাম।

- কি মিথ্যুক!

—কে শেখাল?

—বিসরা শিখিয়েছে মা! আচ্ছা তুমিই বল, ও যদি আটটায় ওঠে আর নটায় অফিসে বেরোয়, রাঁধবে কখন?

—বিসরা কখন যেত?

—কেন, বিকেলে?

স্বাহার মনে পড়ল, বিসরা বলে রোজ কালি মন্দিরে যায়। তবে ওখানে যায়? উনি বললেন, আমিই তো পাঠাই ওকে।

—তুমি পাঠাও?

—বাঃ তোমাদের খবর পেতে ইচ্ছে করে না ?

নীল বলল, বিসরাব যা আদব আমার বাড়িতে ! দেখ না, আমাকে এটা বুনে দিয়েছে। আব আমার চেয়ে অনেক দামী উলে বুনে দিয়েছে বিসরাকে।

-কি সুন্দর বোনা ! আমাকে একটা বুনে দিও তো ?

—তোমাকে বলতে লজ্জা করছিল, এই ষ্টোলটা তোমাব জন্যেই বুনেছি। দেখতো কেমন হয়েছে ?

—খু......ব সুন্দব। দাও, গায়ে দিই।

--তোমার গায়েব ষ্টোল নিয়ে ওর সঙ্গে যা ঝগড়া। বলে, মাব হাজারটা আছে।

সব দিয়ে দিয়েছি নীল।

-বাঃ, খুব ভাল কবেছ।

সোনালি, একটা কথা।

—বল, মা ?

—তোমার সর্দি হয়েছে ?

--ভীষণ।

--দেখ, পারবে কিনা।

—বলই না।

-- তোমার আবাব সর্দি।

—তাতে কি ?

--খাবাব এখানে ট্রলিতে আছে।

—মা গো ! এত সুন্দর খাবাব একটু গন্ধ পাচ্ছি না ?

তুমি যদি কফিটা কর।

নিশ্চয় ! কিচেনে যাব তো ?

—না, না, কদ্দিন আস না, কিছু জান না এখন। এখন এই ঘরের সঙ্গের পাশের ছোট ঘরটায় একটা মিনিকিচেন করে নিয়েছি।

— সেখানে সব আছে তো ?

—সব। গ্যাসটা……

—জ্বেলে নেব।

সোনালি চলে গেল। স্বাহার চোখ এখন মেদুর, কোমল। বললেন, নীল, আমি খুব খুশী হয়েছি এখন!

—আরো খুশী করে দেব?

—কি করে?

—জানো, সোনালির এই সামনের মে-মাসে……কিসের গন্ধ বলতো? গ্যাসের গন্ধ আসছে কেন?

—বাচ্চা হবে?

স্বাহা এই স্বাভাবিক প্রশ্নটা ভীষণ, আর্ত চিৎকারে করলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, সোনালি গ্যাস জ্বেল না।



আর সঙ্গে সঙ্গেই সোনালি চেঁচিয়ে উঠল, জ্বলে গেলাম, আগুন, বাতাসে আগুন……

নীল ছুটে গেল। আর স্বাহা চেঁচিয়ে উঠলেন, নীল, নীল—

আগুন, ভীষণ আগুন… আগুনে-বাতাসে কোলাহল……স্বাহার আর্ত চিৎকার……নীল আর সোনালির চিৎকার……স্বাহা ছুটে ওদিকে গেলেন……ফিরে এলেন……চেঁচিয়ে ডাকলেন, বিসরা…… ড্রাইভার……বিসরা……

···তারপর অনেক লোক এসেছিল। মিণ্টো পার্কের কাছাকাছি যত লোক ছিল সবাই। কিন্তু কোন কোন সময়ে গ্যাসের আগুন মারাত্মক হতে পারে—সবাই আগুন নিভিয়েছিল। খুব চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সব সময়ে চেষ্টাতেও ফল হয় না।

অ্যাম্‌বুলেন্‌স যখন এল, তখন সাহা নিচু হয়ে চেঁচিয়ে ডেকে চলেছেন, কাঁদতে কাঁদতে, নীল! সোনালি! নীল! সোনালি! নীল······

অ্যাম্‌বুলেনসের লোকদের বলেছিলেন, নীলকে ফিরিয়ে দাও, আমার ছেলে নীল! বিসরাকে বলেছিলেন, ওর বাবার চেয়ে অনেক বড় মরদ ছিল বিসরা, অনেক বড়-

তারপর বাড়িটার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, কি খুশী হয়েছ? খুশী? বল—

আগুনকে বলেছিলেন, তোমাকে না আমি ভালবাসতাম? আমার সবস্ব কেড়ে নিলে?

তারপর বলেছিলেন, আমাকে নিয়ে চল। আমি ওদের মেরে ফেলেছি।

নীল সোনালিকে ধরেছিল। ওই ভাবেই ওদের নিষ্প্রাণ শরীর অ্যাম্‌বুলেনসে তোলা হয়।

(আমরা ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা জানলাম। এখন বর্তমানে ফিরে আসব। ফিরে আসব কাহিনীর শুরুতে। এ কাহিনীর শুরুর মধ্যেই শেষের অংকুর নিহিত আছে।)

১৯৬০ ডিসেম্বর

কফি খাওয়া শেষ হয়েছে। স্বাহা সোনালির চুলে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছেন। সোনালি চুপ করে বসে আছে। নীল পাইপ টানছে। নীলের চোখ এখন শান্ত, সুদূর, ধূসর --ও কি ভাবছে তা বোঝা যায় না।

স্বাহা বললেন, চল সোনালি, তোমাকে গ্যালারি দেখাই।

-চলুন।

--বাড়িটাও দেখবে চল।

-- চলুন।

নীল সোনালির দিকে চাইল, চোখ নামাল।

সোনালি বলল, যাব?

স্বাহা বললেন, ও যাবে নীল?

নীল বলল, বা, আমি কি বলব? নিশ্চয় যাবে।

স্বাহা উঠলেন, সোনালিকে সঙ্গে নিলেন। এই ঘরের বাঁ দিকে করিডোর, কাঠের মেঝে। চওড়া করিডোরে আলো জ্বলছে। দুপাশে মাউন্ট করা বাঘ, চিতা, চিতল, সম্বর, ভালুকের মাথা।

স্বাহা বললেন, কার ট্রফি বলতে?

--আপনি বলুন?

---এগুলো সব অনলের ট্রফি।

---খুব ভালো শিকারী ছিলেন?

—ক্র্যাক্ শট্।

—তার মানে কি?

—গুলি ফস্‌কাতো না।

-এই এত জানোয়ার মেরেছেন?

—ও ইয়েস।

—খুব সাহস তো?

—সাহস তো ছিলই।

—কি লেখা আছে?

—শিকারের তারিখ।

এ কি, এ হরিণটা আপনার মারা?

—হ্যাঁ।

-আপনিও শিকার করতেন?

—অনলের তো কাণ্ড। ও যা করবে, আমায়ও করতে হবে। শিকার করবে তো আমাকেও শিকার করতে হবে।

কোথায় মেরেছিলেন? কি লেখা আছে?

উড়িষ্যার জঙ্গলে

—পায়ে হেঁটে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। একজন প্রিনসের সঙ্গে গিয়েছিলাম আমরা। তা প্রিনস বললেন, মিসেস রায় হ্যাভ এ ট্রাই।

—এর আগে বন্দুক ছোঁড়েননি কখনো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অনল শিখিয়েছিল।

ওরা সবাই গ্যালারিতে ঢুকলেন। পরপর দুটি লম্বাটে হলঘর ছিল বোধ হয়। মাঝের দেওয়াল ভেঙে ফেলে একটি বিশাল, লম্বাটে গ্যালারি তৈরি হয়েছে।

স্নাহা আলো জ্বাললেন। এ ঘরে এত আলো! সোনালির চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। অনেক আলো, গিলটি করা ফ্রেমে মানুষ প্রমাণ ছবি সব। স্নাহা একটি ছবির সামনে দাঁড়ালেন।

—দেখ, ইনি হলেন আদিনাথ বসু। আমার দাদাশ্বশুর 'রাজা' খেতাব পেয়েছিলেন! মস্ত জমিদার ছিলেন।

—কোথাকার ?

--পীরহাটির।

—সেখানে কেউ থাকেন ?

- কে থাকবে বল ?

—বাড়ি আছে ?

হ্যাঁ, বাড়ি আছে, তবে আমাদের নেই।

- তার মানে ?

—নীলের বাবার মৃত্যুর পরই ও বাড়িটা আমি ওর নামে কলেজ করে দি।

আমার বিয়েতে দু জায়গায় বউভাত হয়। এখানেও ওখানেও

খুব ধুমধাম হয়েছিল ?

—তখনকার দিনে দু লাখ টাকার বউভাত।

--দু লা-খ-টা-কা!

তার কমে হত না।

—খুব রূপবান।

—হ্যাঁ, আর ওর রূপ পেয়েছিল নীলের বাবা।

-এ ছবিটা কার ?

—আমার দিদিশাশুড়ীর। নীলনলিনী দেবীর।

কি সুন্দর চেহারা।

—ওই অত রূপ তো, কিন্তু স্বামীর মন পাননি।

—ও!

-মন পেয়েছিল এরা।

—এরা কারা ?

দাদাশ্বশুরের শখের বাইজী।

- এত সুন্দর মানুষ হয় ?

—হ্যাঁ, সুন্দরই ছিল।

—এটা কার ছবি ?

—নীলের ঠাকুর্দা, ঠাকুমার।

—আপনার শ্বশুর-শাশুড়ীর?

—হ্যাঁ।

—এটা কে?

- দিদিশাশুড়ীর কোলে নীলের বাবা।

--ওঁর কাছেই তো মানুষ।

—হ্যাঁ। বাপ-মা ছিলেন না। ওঁর কাছে মানুষ, ওঁর সম্পত্তিতে ধনী, ওর সর্বস্ব।

এটা কে?

দাদাশ্বশুরের মাহুত।

--ওরও ছবি এখানে?

-শিকারে বাঘ চার্জ করে। ওঁকে বাঁচাতে গিয়ে ও মরেছিল।

- এটা কে? কোনো সায়েবের ছবি?

--নীলের বাবা।

- এত সুন্দর!

—এত সুন্দর।

—এই স—ব ওঁর ছবি?

- স—ব।

—আপনার ছবি?

—এই দেওয়াল জুড়ে।

—আপনার ছবি!

—ওর শখ!

—এই তো রাজপুতানার পোশাকে।

—এটা গাউন পরে।

—গাউন পরতেন?

—পরতাম।

—এটা কি?

—সিমলায় বিউটি কুইন হয়েছিলাম, তার ছবি।

—রানীর মতই দেখাচ্ছে।

—এটা দেখ!

—কি পরেছিলেন?

—হীরে।

—রানীর সাজে, সিংহাসনে?

—হ্যাঁ, সিংহাসন ছিল একটা।

—এখন নেই?

—নাঃ, বেচে দিয়েছি।

—বেচে দিলেন?

—কি করি বল? দেশের বাড়িতে ছিল। বাড়ির জিনিস, কোন ভাইসরয়ের জন্যে করানো।

—দেশের বাড়িতে ছিল?

—হ্যাঁ, সে সব আসবাব এ বাড়িতে ধরত না।

—এটা বিয়ের ছবি?

—হ্যাঁ।

—কি সুন্দর আপনি, অপরূপ!

—এখন আর নেই।

—যা আছে……মানে………

—থাক্, চল যাই।

—এটা লিফট?

—আমার প্রাইভেট লিফট। যখন ইচ্ছে করে আমি এসে এগুলো দেখি। দাঁড়াও, স্টোরটা খুলি

—এ ঘরে কি আছে?

—বাসনপত্র।

—বাসনপত্র!

—হ্যাঁ, দেখ না, পুব দেওয়াল জুড়ে রূপোর বাসন।

—এত !

—একশো জনের মত। এগুলো সব বিলিতি বাসন, মানে এ ঘরে।

—এগুলো ?

—পশ্চিম আর দক্ষিণে কাচের, চায়নার বাসন। সবই একশো জনেব মত।

—এ ঘরে কি ?

—দেশী বাসন।

—বাব্বা। এ যে দোকানের মত।

—এ সব রান্নার বাসন, পাঁচশো জনেব মাপের।

—এ ঘরেও বাসন ?

—এই ফুলদানী, ট্রে, মূর্তি, দেশের বাড়ির সব।

- এগুলো কি ?

—পেতলের পরী। বাতিদান ওগুলো।

-এবার কোথায় যাব ?

--ওপরে যাই চল ?

লিফটে ওপরে উঠলেন ওরা।

-দেখ, এটা নাচের মহল।

ওদিকে যাবেন ?

—না, না। খুব অগোছালো সব। এদিকে এস।

- এটা কি ?

—আমাদের লাইব্রেরী।

—এই এত বই ?

--নিচের গ্যালারির মাপে ওপরের লাইব্রেরী।

—কে দেখে রাখে ?

—লোক আসে সপ্তাহে।

—এখানে কি ?

—আমার ছাদের বাগান দেখ।

—কত ফুল ফুটেছে।

—আগে এখানে জালে ঘিরে পাখি রাখা হত।

—কে বাগান করে?

—মালী আসে।

—এ ঘরগুলোয় কেউ থাকে না?

—কে থাকবে বল?

—কত ঘর।

—সব খালি।

—সাজানোই আছে।

—সাজানো থাকলে কি হয় বল। মানুষ তো নেই।

—মানুষ না থাকলে কি ভালো লাগে?

—আর কি জানো, এক বড় বাড়ি থাকলে লোকজনও লাগে অনেক। এখন তো সে দিনকাল নেই? গুটি কয়েক ঝি-চাকর দিয়ে কষ্ট করে চালাই।

—এদিকে কি?

—আমার মহল।

—এটা?

—আমার প্রাইভেট সিটিং রুম। এদিকে এস।

—এই ঘরে যাব?

—এস, আমার ড্রেসিং রুম।

—কি সাজানো ঘর!

—দেখ, এগুলো সিল্কের শাড়ি। এদিকে সুতি, এগুলো গরম জিনিস। এগুলো ব্লাউজ।

—এটা?

—এটাও একটা ড্রেসিংটেবল। ব্যবহার করি না।

—এটা?

—আমার শোবার ঘর। এস।

বিশাল ঘর। নীল ভেলভেটের পর্দায় দেয়াল ঢাকা। মেঝেতে নরম গালচে, পা ডুবে যায়। মস্ত বড় খাট, তাতে সাটিনের বিছানা।

—আমাদের বিয়ের খাট।

কোন বৃদ্ধা, প্রাচীনা, বয়স্ক ছেলের মার ঘর নয় এটা। যৌবনের ঘর, বিছানার রং লাল।

- আমার ড্রেসিং টেবল।

—কি সুন্দর!

- এবার দেখ।

—কি দেখব?

—দেখ!

স্বাহা ভেলভেটের পর্দা সরালেন দেওয়াল থেকে। দেওয়ালে গাঁথা, দেওয়াল জোড়া, স্টিলের সেফ।

সেফ খুললেন, আলো জ্বালালেন।

স্টিলের পর কাচ, কাচের ভেতর আলো জ্বলল। নীল ভেলভেটের উপর হীরের পর মুক্তো, মুক্তোর পর চুনী, চুনীর পর পান্না, পান্নার পর সোনা।

মাথার মুকুট-টায়র, সিঁথি-ঝাপটা থেকে পায়ের গুজরীপঞ্চম পর্যন্ত শত শত গয়না। সোনালির চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

—কি দেখছ সোনালি?

—কি বলব?

—এই স—ব আমার।

—জানি।

—সোনালি!

—বলুন!

—যা দেখলে, এই স—ব তোমার হবে।

—আমার!

—স—ব।

—আমার!

—স—ব সোনালি, সব!

—আমার!

—তোমাকেই দেব। আর কাকে দেব বল?

—আমাকে!

—হ্যাঁ সোনালি। শুধু······

—কি?

—তুমি আমার ঘরে এস।

—আমি তো··········

—আমার ঘর ভরে উঠুক সোনালি, আমার বুক ভরে উঠুক। নীল, আমার ছেলে, তুমি তার বউ হয়ে এস।

—আমি······

—না না, বউ নয়, বউ নয়, আমার মেয়ে হয়ে এস।

—মেয়ে? আমি কি আপনার মেয়ে হবার যোগ্য?

—সে আমি বুঝব সোনালি।

—কিন্তু······

বল, আসবে?

—আমি······

—বল?

—আসব।

সোনালি মন্ত্রমুগ্ধের মত বলল। কোন ক্ষমতা নেই ওর, স্বাহার কাছে ও বিবশ, সমর্পিত।

—আর একটা কথা······

—বলুন?

—তুমি আমাকে একবার 'মা' বলে ডাক।

—আমি!

—হ্যাঁ সোনালি। একবার 'মা' বল, আমি শুনি।

—ম্.........ম্.........মা!

—আবার বল।

—মা!

—আবার, আবার, আবার!

—মা, মা, মা!

সোনালি কান্নায় ভেঙে পড়ল। স্বাহা ওর মাথা বুকে টেনে নিলেন, মাথায় হাত বোলাতে থাকলেন।

স্বাহার চোখ বিজয়গর্বে ঝকঝক করতে লাগল।

অনেক, অনেকক্ষণ সময় গেল।

স্বাহা বললেন, চল, নিচে যাই।

—চলুন।

দুজনে নিচে নামলেন। নীল আগুনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—নীল!

- বল মা!

—সোনালিকে সব দেখালাম।

—সে তো জানি।

—এখন কি করবে?

—ওকে পৌঁছে দিই?

—কটা বাজল?

—ন'টা।

—সোনালিকে ফিরতে হবে তাই না?

—হ্যাঁ।

—তবে দেরি কোর না।

—না, দেরি করব না।

—গাড়ি আছে তো?

—হ্যাঁ।

—ড্রাইভারকে সঙ্গে দেব ?

—না না, আমার গাড়িতে যাব তো।

—বিসরা কোথায় বল তো ?

—বাইরে গেল।

—খুব শীত বাইরে ?

—এমন কি আর!

—তবে দেরি কোর না।

সোনালি স্বাহাকে প্রণাম করল। স্বাহা ওর মাথা, গালে চুমু খেলেন।

ওরা বেরোল। স্বাহা হেলান দিয়ে বসলেন চেয়ারে।

বাইরে অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বিসরা এগিয়ে এল। বলল, খোকা—

—কি রে ?

—তোরা এ বাড়িতে থাকিস না।

—কি বলছিস ?

—তোকে নয়, মেয়েটাকে বলছি।

—মেয়েটা কোথায় দেখলি ?

—ও তোর বউ হবে তো ?

—দেখা যাক।

—এই মেয়ে! তুই এ বাড়িতে থাকিস না। পালিয়ে যা। এ বাড়ির নিঃশ্বাসে বিষ আছে।

—বিসরা, নেশা করে বকাছস নাকি ?

—চলে যা তোরা!

অতর্কিতে সরে গেল বিসরা, যেন এখানে ছিল না ও। অন্ধকার এসে ওর জায়গাটুকু গ্রাস করল।

নীল গাড়িতে উঠল, সোনালিও। গাড়ি বেরিয়ে গেল।

ঘরের ভেতরে স্বাহা চেয়ারে হেলান দিলেন। কাঠের কুচি ছুঁড়লেন আগুনে।

আস্তে বললেন, আগুন আমার এত ভাল লাগে!